প্রবাস বন্ধু

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩৩

১৪৩৩ প্রবাস বন্ধু : সূচীপত্র : নববর্ষ সংখ্যা 2026

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	2
গদ্য		
মন-উড়ান	অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস (ফিনিক্স, অ্যারিজোনা)	3
নাম রেখেছি বনলতা...	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	4
তুমি কোন অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	6
মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মৌলিক দর্শন	শেলী শাহাবুদ্দিন (স্টোন মাউন্টেন, জর্জিয়া)	10
শৈশব স্মৃতি	শ্যামল মজুমদার (দিল্লী, ভারত)	11
আন্দামান ভ্রমণ – পর্যটন নাকি অনুভূতি	বীরেশ্বর মিত্র (পুনা, ভারত)	16
টুকরো কথারা	জয়তি বোস (কলকাতা, ভারত)	18
ধরিত্রী	আশীষ দত্ত রায় (মানালি, ভারত)	19
মুক্তি	নন্দিতা ভট্টাচার্য্য (কলকাতা, ভারত)	22
অল্প গল্প আর একটা কবিতা	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	23
কিছু স্মৃতি	স্যমন্তক দত্ত (কলকাতা, ভারত)	46
সেনানী	আনন্দিতা চৌধুরী (ইস্ট ব্রান্সউইক, নিউ জার্সি)	49
('A White Heron' by Sarah Orne Jewett)		52
একটি সাদা বক	অনুবাদ: নূপুর রায়চৌধুরী (অ্যান আর্বার, মিশিগান)	
একমুঠো নিঃশ্বাস	বিষ্ণুপ্রিয়া (ইউ এস এ)	59
মোহমুক্তি	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	61
বুড়ো-ছোঁড়ার জাঁতাকলে	শান্তনু চক্রবর্তী (এডিনবার্গ, টেক্সাস)	64
কবিতা		
পুরানো সেই	সুজয় দত্ত (ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো)	25
পৃথিবী	কমলপ্রিয়া রায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	27
মনসঙ্গীত ১, মনসঙ্গীত ২, আমার রবীন্দ্রনাথ	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	27, 28
বন্ধু মনে পড়ে	দেবাশিস মজুমদার (অ্যালেকজান্ড্রিয়া, ভার্জিনিয়া)	29
জয় পরাজয়	ডাঃ শান্তনু মিত্র (কলকাতা, ভারত)	29
মানুষ, তিলোত্তমা, দেরী	সুশোভন মুখোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	31
মিষ্টি, মন প্রাণ	বাপ্পাদিত্য (হিউস্টন, টেক্সাস)	32, 33
সময়	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	33
অবশিষ্ট আলো	বাপন দেব লাড়ু (মেদিনীপুর, ভারত)	33
সোনালী মৌনতা	সুব্রত ভট্টাচার্য (কলকাতা, ভারত)	34
হারাই	মালবিকা চ্যাটার্জী (ডিকেটার, জর্জিয়া)	34
সর্বনাশী, কে আছে	শঙ্কর তালুকদার (কলকাতা, ভারত)	35
জোছনা করেছে আড়ি	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	36
মানুষের রং-ঢং, কিছু প্রশ্ন-ভাবনা, বাংলাদেশের ভিত্তি ও পরিচয়	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	36, 37
বেভুল পাখি	বেনজির শিকদার	38
ক্ষমা	পৃথা চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	38
মেহগনি রাতের গান	ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী (হিউস্টন, টেক্সাস)	39
সময়চক্র	শ্রীকুমার রায় (কলকাতা, ভারত)	40
নামহীন একটা মেয়ে, বিপরীত সমীকরণ, তাতে ভারি বয়েই গেল	তুহিনা সুলতানা (বর্ধমান, ভারত)	41, 42, 43
যোজন অনুভূতি	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	44
সংঘাত, পুরাতন, আসল নকল, সময় চোর	পারমিতা বসু (কলকাতা, ভারত)	45

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩৩, এপ্রিল ২০২৬

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ (হিউস্টন, টেক্সাস)

প্রচ্ছদ চিত্র:

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

কার্যনির্বাহী সদস্য:

চন্দ্রা দে

শ্যামলী মিত্র

অসিত কুমার সেন

সুজয় দত্ত

মালবিকা চ্যাটার্জী

প্রবাস বন্ধু পত্রিকা কেবলমাত্র

‘প্রবাস বন্ধু ওয়েবসাইট’-এ প্রকাশিত হয়

https://www.prabashbandhu.org/

সম্পাদকীয়

শ্রী সারদা মা বলে গেছেন – "যদি শান্তি চাও তো কারোর দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।"
খুব সুন্দর ভাবনা। কিন্তু এই শান্তির অন্বেষণে যদি দোষীকে বেমালুম ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তো মহা সংকট!
এক্ষেত্রে কি মায়ের বাণী একটু অগ্রাহ্য করা যেতে পারে? বড়ই বিপদসংকুল অবস্থা যে!
আবার অপরপক্ষে শুধু দোষীর দোষ নির্ধারণ করলেই তো চলবে না, তার প্রতিকারের পথটিও খুঁজে নিতে হবে।
অথচ সেই পথের দিশা খুঁজতে গিয়ে প্রায়শই নানান অঘটন ঘটে যায়।
নিজেদের স্বভাব ও কর্ম নিয়ন্ত্রণে রাখার শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন শ্রীমা। আমরা সাধারণ মানুষরা এই যুগে সেই ভাব কতটা বজায় রাখতে পারি সে এক কঠিন পরীক্ষা। আমাদের সব কর্মের মধ্যেই কি স্বার্থ জড়িয়ে নেই?
নিঃস্বার্থভাবে সকল দিক বিচার করার ক্ষমতা সেইসব মহামানবরাই রাখতেন, যাঁদের অভাব আমরা বোধ করি।

বছর ঘুরে এল। নতুন উদ্দীপনা এবং উৎসাহ নিয়ে আকাশ প্রদীপে "বিঘ্ন দাও অপসারি" প্রার্থনা পাঠিয়ে দিই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। নতুন বছর মানেই পুরনো গ্লানি মুছে ফেলে নতুনের শুরু। যারা এই বৈশাখ / এপ্রিল মাসে নতুন বছরকে আহ্বান জানায়, তাদের কাছে পয়লা বৈশাখ একটি মহোৎসব। মানুষ ভেদাভেদ ভুলে মেতে ওঠে শুভ সূচনার প্রয়াসে।
নতুন বছর শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।
প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভ কামনা।
মালবিকা চ্যাটার্জী

পত্রিকায় ব্যবহৃত অনুল্লিখিত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।

মন-উড়ান

অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

ছোটবেলায় 'কলকাতা' শব্দটা শুনলেই মনে হতো মামাবাড়ি, মাসির বাড়ি, কাকুর বাড়ির কথা। দোমিনিক লাপিয়ের "সিটি অব জয়" উপন্যাসের সাহসী, দুর্নিবার কলকাতা বা আমাদের আদরের আনন্দনগরী – কলকাতা মানেই গলার কাছে পাকিয়ে ওঠা একদলা আবেগ আর নস্টালজিয়া।

মুর্শিদাবাদ থেকে গরমের ছুটিতে বা বড়দিনের সময় বাস বা ট্রেনে লম্বা এক জার্নি করে পৌঁছে যেতাম কলকাতায়। পরের দিন সব গুছিয়ে টিফিনবাক্স ভরে যাওয়া হবে চিড়িয়াখানায়। কালেভদ্রে কলকাতায় যাওয়া আমাদের, বড়দিন তাই বড় আনন্দের। মণিমা, মা ব্যস্তহাতে সকালবেলা বানিয়ে ফেলত লুচি,আলুরদম – সন্দেশ আর শীতের কমলালেবু নিতেও ভুল হতো না; ভাইবোনেরা মিলে গুছিয়ে নিতাম ক্যামেরা, সতরঞ্চি আর ব্যাডমিন্টন। একরাশ হৈচৈ নিয়ে শুরু হয়ে যেত কলকাতার একটা নিপাট ছুটির দিন! কলকাতা ঠিক মায়ের আঁচলের আরামের মতো... পুরনো, সুন্দর; সক্কলকে সঙ্গে নিয়ে চলতে পারার আনন্দ আর ছোটবেলার স্মৃতির বুনন।

এই শহর একটা গল্পের মতো – যেখানে জীবনের রং যে কোনো ফিল্টারের চেয়ে উজ্জ্বল। ঠিক যেমন সকালের নরম আলো আর শীতের দুপুরে লেপের আড়ালে আড়মুড়ি ভাঙা। "ঘন হয়ে ঘোমটা নামে কুয়াশার, যেমন নামে মাঘ মাসের কলকাতায়, হঠাৎ কোনো-কোনোদিন,প্রথম কোকিল ডেকে ওঠার আগে..."। কলকাতার সারল্য গরম চায়ের চুমুক আর নতুন গুড়ের গন্ধ মাখা। বর্ষায় থৈথৈ একহাঁটু জলে ডোবা রাস্তায় কাগজের নৌকা ভাসানোর ছেলেবেলা জড়ানো। গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদ্দুরে ট্রামে চড়ে এসপ্ল্যানেডে যাওয়া। গিরিশমঞ্চে নাটক দেখা, কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া, কফি হাউজের আড্ডা, হাওড়া ব্রিজের নিরন্তর কোলাহল, হলুদ ট্যাক্সি আর হাতে টানা রিক্সায় চড়ে উত্তর কলকাতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো; নন্দনে সত্যজিতের ছবি, নবীন দাসের রসগোল্লা, ইলিশ বনাম চিংড়ি আর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে অবিরাম বিবাদ; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সবুজ ঘাসে বসে জীবনানন্দের কবিতা পড়া। শহরের বয়স বাড়ে, নতুন হাইরাইজ, রাস্তা, ফ্লাইওভার তৈরী হয়, কিন্তু এই শহরের আনাচ কানাচ নিত্য নতুন জীবনের ছন্দে সবসময় প্রাণবন্ত, স্পন্দন-মুখর! সেই ছবিগুলোর বয়স বাড়ে না কখনো।

আজও নতুন বছরের প্রাক্কালে হাজার কাজের ভিড়ে ঠাসা দিনটায় সেই স্মৃতির সুতো আঁকিবুকি কাটে; কলকাতা ঘুম ভেঙে ওঠে আরও একটা পয়লা বৈশাখের ভোরে। হাজার মাইল দূরে পৃথিবীর ঠিক অন্য এক প্রান্তে বসে আমার চিন্তায়, মননে ভেসে ওঠে ফেয়ারিটেল সলমা-জরি। বাংলাভাষা, বাঙালি খাবার, পাটভাঙা শাড়ি, বাঙালিয়ানা আর প্রিয় মানুষগুলোর সাহচর্য্যে পয়লা বৈশাখের স্মৃতি... সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বুক ভরে সেই অক্সিজেন নিয়ে এঁকে ফেলেছি আজকের লেখার সঙ্গের ছবিটা। বৃত্তাকার ক্যানভাসের ওপর acrylic রঙের ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে আমাদের সকলের প্রিয় কলকাতা।

শুভ নববর্ষের অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা সকলকে! একরাশ হাসি ভরে তুলুক নতুন বছরের প্রতিটি দিন।

শিল্পীঃ অনিন্দিতা রায় বিশ্বাস

নাম রেখেছি বনলতা...

সুজয় দত্ত

বেশ করেছেন রেখেছেন, কিন্তু একটু ভেবেচিন্তে করা উচিত ছিল কাজটা। কী থেকে যে কী হয়, বলা তো যায় না। জানা নেই বোধহয় যে স্রেফ এই নামকরণের জন্যই প্রখ্যাত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে হারাতে হয়েছিল এক দারুণ সুযোগ – তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন আরেক প্রখ্যাত শিল্পী শ্যামল মিত্র? আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে অর্থাৎ ১৯৬১-তে প্রতিভাবান সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত ঠিক এই কান্ডটাই ঘটিয়েছিলেন তাঁর লেখা "নাম রেখেছি বনলতা যখন দেখেছি" গানটায় | ধনঞ্জয়বাবুকে গানটা গাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হ'ল যখন, উনি দুঃখের সঙ্গে জানালেন তা সম্ভব নয়। কারণ আর কিছুই না – ধনঞ্জয়ের শাশুড়ির নাম বনলতা দেবী, অতএব যে গানের ছত্রে ছত্রে বনলতা সম্পর্কে অমন রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলা আছে তা তিনি প্রকাশ্যে উচ্চারণ করেন কী করে? অগত্যা শ্যামলবাবুকে ধরা হ'ল এবং তিনি লুফে নিলেন | বনলতার বদলে গীতিকার 'চারুলতা' বা 'কমললতা' লিখলে কি আর এ জিনিস হতো?

তাই বলি, নামকরণের আগে দুবার কেন, পাঁচবার ভাবা উচিত। কিন্তু লোকে তো শোনে না। যেমন, ছেলের নাম যাঁরা রাখেন 'রমাপদ' বা 'উমানাথ' বা 'গৌরীপ্রসন্ন', তাঁদের কি একবারও মনে হয় না যে অনিবার্য সংক্ষিপ্তকরণের ফলে নামগুলো শেষ অবধি কী দাঁড়াবে আর তার দরুণ একটা মানুষকে সারাজীবন কতটা অস্বস্তিতে থাকতে হবে? ঠিক তেমনি, কারুর নাম 'পুলিনবিহারী' হলে তাকে বয়সকালে ছেলেছোকরারা ফাজলামি করে 'parcel' বলে ডাকতেই পারে (যদি অবশ্য 'পুলিন্দা'-র এই ইংরেজি প্রতিশব্দটা তাদের জানা থাকে, যা আজকালকার যুগে বিরল)| নামের এই কাটছাঁট-জনিত বিভ্রাট সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 'মণিমোহন', 'মণিশঙ্কর', 'মণিকা' আর 'মনীষা' নামধারীদের সবাইকেই বন্ধুমহলে বা পারিবারিক গন্ডিতে ডাকা হচ্ছে 'মণি' বলে – এই উদাহরণ তো খুব পরিচিত। সুতরাং মুখোমুখি আলাপের আগে নামগুলোর এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শুনে যদি অচেনা কেউ লিঙ্গসংশয়ে ভোগেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না | একই সমস্যা 'রাধাকান্ত', 'রাধারমণ', 'রাধারাণী' আর 'রাধাশ্রী'-কে নিয়েও | এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আমার অধ্যাপক জীবনের একটি ঘটনা | আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি যে বিভাগে, সেখানে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রছাত্রীরা ডক্টরেট করতে আসার আবেদন করে – ভারতীয় উপমহাদেশ থেকেও | সেই ভারতীয় আবেদনকারীদের একজনের নাম যে রাধা এবং তার আবেদন যে মনজুর হয়েছে , সেকথা কিভাবে যেন চাউর হয়ে যাওয়ায় ছাত্রমহলে তুমুল উৎসাহ আর গুঞ্জন তাকে নিয়ে। ওই বয়সের অবিবাহিত যুবকদের যা হয় আর কি | তারপর যখন দেখা গেল নবাগতর পুরো নাম রাধাকৃষ্ণণ শ্রীকুমার নাগরাজন, তখন বেচারাদের চুপসে যাওয়া মুখগুলো দেখে বেশ মজা পেয়েছিলাম।

নাম কাটছাঁটের আদৌ দরকার পড়ত না যদি এক বা একাধিক মধ্যনাম (middle name) যোগ করে নামটাকে দীর্ঘায়িত না করা হতো | বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে এই মধ্যনামের বহর আর তার কারণ হয়তো আলাদা – কোথাও পিতৃপুরুষের নামের একাংশ ঢুকিয়ে দেওয়াটা ঐতিহ্য, কোথাও আবার কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত সম্প্রদায়ের পরিচয়বাহী এক বা একাধিক শব্দ ঢুকিয়ে দেওয়াটা রীতি, কোথাও হয়তো গ্রাম বা জেলার নাম | আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রে (অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে) এগুলোর কোনোটাই নেই, তবু 'চন্দ্র', 'কুমার' বা 'কান্তি'র ছড়াছড়ি নামের মাঝখানে | 'শেখর', 'ভূষণ' আর 'প্রতিম'ও মিলবে অনেক। দৈনন্দিন ব্যবহারের সময় আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওগুলো উহ্যই থেকে যায়, অথচ 'পবিত্র কান্তি'র সঙ্গে 'পবিত্র কুমার'কে অথবা 'বিধুভূষণ'-এর সঙ্গে 'বিধুশেখর'কে গুলিয়ে ফেললেই নামের মালিকের গোঁসা | আচ্ছা মুশকিল তো! আপনি স্টাইল করে কাঁচি চালিয়ে লিখবেন 'Pabitra K. Roy' (সেই নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর আজীবন নিজেকে 'নীরদ সি চৌধুরী' বলে পরিচয় দেওয়ার মতো), আর 'K' মানে কান্তি না কুমার না কচ্ছপ না কেউটে সেটা আমি জ্যোতিষী হয়ে ঠিকঠাক বুঝে নিতে না পারলেই দোষ? এই জন্যই এই মধ্যনাম জিনিসটাকে মাঝে মাঝে অ্যাপেন্ডিক্স বা আক্কেল দাঁতের মতো মনে হয় – কাজে লাগে না, শুধু ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ।

অবশ্য শুধু মধ্যনামকে দায়ী করে লাভ নেই। পদবী

নিয়েও হাজার রকম সমস্যা | আমাদের ক্ষেত্রে তার একটা বড় কারণ একশো নব্বই বছরের ব্রিটিশ শাসন | মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় আর চট্টোপাধ্যায়কে মুখার্জি, ব্যানার্জি আর চ্যাটার্জি বানালি যখন তোরা, সামঞ্জস্য রাখার জন্য গঙ্গোপাধ্যায় কে গ্যাঙার্জি আর শুধু উপাধ্যায়কে আর্জি বানিয়ে যা | তা নয় – কোথা থেকে আমদানি হ'ল গাঙ্গুলি | তার ওপর আবার ইংরেজিতে লেখার সময় একেকটা পদবীর একগন্ডা করে বানান! মুখার্জি লিখতে k-এর পরে h লাগবে কি লাগবে না, তার ঠিক পরেই a হবে না e হবে, শেষকালে ji না jee – এগুলো নিয়ে মতৈক্য বিধানসভা বা লোকসভায় সরকারপক্ষ আর বিরোধীপক্ষের বড় বড় রাজনৈতিক ইস্যুতে মতৈক্যের চেয়েও দুর্লভ | ব্যানার্জি আর চ্যাটার্জিরও একই হাল | তাদের তৎসম রূপগুলো ইংরেজি হরফে লিখতে গিয়েও কেন যে মানুষ 'padhyay', 'paddhyay', 'padhaya' ইত্যাদি জটিলতা বাঁধিয়ে রেখেছে, কে জানে| ভট্টাচার্য্য আর চক্রবর্তীতেও নিস্তার নেই | 'charya' না 'charyya', 'barti' না 'borty'' না 'bortti' – সেই নিয়ে সংশয় আর বিভ্রান্তির ঝুলি সবসময়েই ভর্তি (তার সঙ্গে আবার 'varty' আর 'verty' এসে জোটায় আরোই ঘেঁটে ঘ)| অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট পদবীগুলোও কম জ্বালায় না | 'De' বনাম 'Dey', 'Roy' বনাম 'Ray' কিংবা 'Pal' বনাম 'Paul'-এর মামলা কি কোনোদিন নিষ্পত্তি হবে? এই শেষোক্ত দুটোকে অর্থাৎ রায় আর পাল-কে অবশ্য ইংরেজিতে যে বানানেই লেখা হোক তার গায়ে একটা বিদেশী বিদেশী গন্ধ থাকে | কিন্তু কর-কে 'Kar' না লিখে কায়দা করে 'Kaur' লিখতে গেলে যে ঝামেলাটা সেটা সম্পূর্ণ দিশী – বাংলা বনাম পঞ্জাব |

কর-এর কথায় মনে পড়ল, কিছু কিছু ক্রিয়াধর্মী পদবী চিরকালই হালকা মজার খোরাক | যেমন, ছাত্রজীবনে নিচু ক্লাসে পড়ার সময় আমাদের ক্লাসে এক শান্ত গোবেচারা-টাইপের ছেলে ছিল, যে পড়াশোনায় খুব সিরিয়াস | ওকে ক্লাসের বিচ্ছু ব্যাকবেঞ্চাররা নিয়মিত 'মুরগি' করত, অর্থাৎ নিজেরা হোমওয়ার্ক ফাঁকি দিয়ে পরেরদিন সকালে ক্লাস শুরুর আগে বা টিফিনের সময় ওকে দিয়ে করাতো আর ও মিউমিউ গলায় প্রতিবাদ করলে ওরা দাবড়ে চুপ করিয়ে দিত | তো এর ফলে অচিরেই ক্লাসে ওর নাম (সুশান্ত কর) পাল্টে আমাদের মুখে মুখে হয়ে গেল 'হোমওয়ার্ক কর'| যাইহোক, এরকম জুলুম তো আর অনন্তকাল চলতে পারে না | একসময় ওর বাবা-মা'র কানে পৌঁছাল ব্যাপারটা, ওঁরা এলেন হেড্ মাস্টারমশাইয়ের কাছে অভিযোগ করতে | তারপর ও এই প্রাত্যহিক দাসত্ব থেকে রেহাই পেলেও নতুন নামকরণ আটকানো গেল না – 'নালিশ কর'| আরও নীচু ক্লাসে অর্থাৎ মর্নিং সেকশনে পড়ার সময় দেখতাম সচ্ছল পরিবার থেকে আসা আমার এক সহপাঠী (যে প্রতিদিন প্রাইভেট গাড়িতে করে স্কুলে আসত-যেত) বেশ বড়সড় ঝকঝকে টিফিন-ক্যারিয়ারে করে রোজ অনেক নতুন রকম খাবার-টাবার আনত | ছেলেটার মনটা ছিল ভাল, তাই আমরা ওর বাক্সে আকর্ষণীয় কিছু দেখে কখনোসখনো ওর সঙ্গে আমাদের খাবার বদলাবদলি করার প্রস্তাব দিলে খুশী মনেই রাজী হতো (এই যেমন, ওর অরেঞ্জ স্পঞ্জকেকের বদলে আমার কড়াপাকের সন্দেশ, ওর ডিমের ডেভিলের বদলে অন্য কারুর আলুভাজা, ইত্যাদি)| ওর আসল নাম বিশ্বদীপ দে, কিন্তু আমরা আড়ালে ওকে ডাকতাম 'টিফিন দে'| বেশ কয়েক বছর পরে ক্লাস টুয়েলভে অর্থাৎ হায়ার সেকেন্ডারীতে যখন আমরা, স্কুলে একজন নতুন শিক্ষাকর্মী বহাল হ'ল | তার কাজ ছিল শুধু আমাদের সায়েন্স ল্যাবরেটরিগুলোয় (পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-জীববিদ্যা) মাস্টারমশাইদের সবরকমভাবে সাহায্য করা | তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস চাকরিটা নেবার সময় একটা বিশেষ কাজের কথা সে কল্পনাও করেনি | বায়োলজি সিলেবাসের একটা বড় অংশ ছিল জুওলজি, সেখানে ব্যাঙ কাটা থাকবেই – সে আমাদের ঘেন্নায় বমি আসুক আর না আসুক | এবং মাঝেমাঝেই প্র্যাকটিকাল ক্লাসে ব্যবচ্ছেদের জন্য ছাত্রদের মধ্যে ব্যাঙ বিতরণ করতে অ্যাকোয়ারিয়ামের ডালা খুললেই বন্দীদশা (তথা আসন্ন মৃত্যু) থেকে মুক্তির এই সুবর্ণ সুযোগ তারা লুফে নিত আর একলাফে সেখান থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়েই সোজা দরজার দিকে চম্পট দিত | তখন তাদের পিছু ধাওয়া করে দুহাতে খপাখপ ধরে এনে আবার অ্যাকোয়ারিয়ামে ভরবে কে? কেন, নিখিলদা | হ্যাঁ, আমাদের সেই নবনিযুক্ত শিক্ষাকর্মীর নাম ছিল নিখিল ধর | কিন্তু প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বায়োলজি ল্যাবে তাকে যেটা করতে হতো, তারপর তার জন্য একটাই 'নিকনেম' বরাদ্দ ছিল আমাদের মধ্যে | 'ব্যাঙ ধর'|

ব্যাঙের কথা উঠল যখন, আমার কলেজ জীবনের

একটা গল্প না শুনিয়ে পারছি না | আমার এক বছরের সিনিয়র ব্যাচে উদ্দীপ্ত সরকার নামে একজন পড়ত | তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মুম্বাইয়ের দিলীপ বেঙ্গসরকার | উদ্দীপ্তদা ছিল ওর দারুণ ভক্ত | তবে কলেজের গোটা ছাত্রমহল যে ওকে 'ব্যাঙ সরকার' বলে ডাকত, তার কারণ শুধু সেটাই নয় | ওর চলাফেরা আর বাচনভঙ্গীর মধ্যে একটা অদ্ভুত তিড়িংবিড়িং ভাব ছিল, সেজন্যও হয়তো | এই সরকার প্রসঙ্গেই মনে আসছে কলেজে আমার আরেক সিনিয়রের কথা | আশির দশকের শেষ দিকে তার স্নাতকোত্তর শেষ করে সে পাড়ি দিয়েছিল উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে | দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারে তখন (প্রয়াত) প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ক্ষমতাসীন পাঁচ বছর ধরে, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে, সেই বছরের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোটের জেতার সম্ভাবনা প্রবল | নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে আমার সেই সিনিয়র দাদাটি যখন প্রথমবারের জন্য অল্পদিনের ছুটিতে বিদেশ থেকে কলকাতা ফিরল, এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই দেখে দেয়ালে দেয়ালে ওর নামে বড় বড় করে স্লোগান লেখা – ওর কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার, ওকে বঙ্গোপসাগরে বা ভারত মহাসাগরে ফেলে দেওয়ার | বলাই বাহুল্য, স্লোগানগুলো রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে, কিন্তু কী আর করা যাবে? আমার সেই সিনিয়রটির নামও যে রাজীব সরকার |

সবশেষে আবার ফিরি গানের কথায় | যে শ্যামল মিত্র "নাম রেখেছি বনলতা"র মতো অমর একটি গান ফাঁকতালে পেয়ে গিয়েছিলেন শুধু 'বনলতা' শব্দটা থাকার কারণে, তিনি অবশ্য তাঁর উজ্জ্বল সংগীত জীবনে নাম-সংক্রান্ত গান কম গাননি – "কী নামে ডেকে বলব তোমাকে?", "হংসপাখা দিয়ে ক্লান্ত রাতের তীরে নামটি তোমার লিখে যাই", "তুমি কি ডাকবে মোরে, চেনা সে নামটি ধরে", ইত্যাদি | সাধে কি আর তাঁকে 'নামী' গায়ক বলি আমরা!

তুমি কোন অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী

হুসনে জাহান

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর |"

প্রথমে নর পরে নারী: দুয়ে মিলে মানব ইতিহাসের শুরু | এর শুরু কোথায়, কীভাবে ও কবে সে তথ্য কিছু হাড়গোড়ের নমুনা ছাড়া সঠিকভাবে জানা নেই | মানুষ নাকি স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি | বুদ্ধি ও ক্ষমতায় ক্রমাগত উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে মানুষ, যার কুল কিনারা পাওয়া যায় না |

মানুষের সারাটা জীবন ভালমন্দের সাথে তাল মিলিয়ে চলে অবসরপ্রাপ্ত সময়ে ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করে দিন কাটে | এই পর্যায়ে পৌঁছেই সম্ভবত জীবনের বোঝাপড়ার ভার সম্পূর্ণরূপে নেওয়া যায় | এর আগের সময়টা নানারকম উত্তেজনা, অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে কেটে যায় | বৃদ্ধাবস্থায় আরও কিছু ভাবনা অনবরত মনে আসে, যেমন – ফেলে আসা জীবনের বিশ্লেষণ, আত্মসমালোচনা, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা এবং অন্তিমের পথ চেয়ে থাকা |
এটি আমার জীবনের স্মৃতিকথা |...

বাল্যের পারিবারিক ঘটনার গল্প, যা গুরুজনদের মুখে শোনা, সেই টুকরো ছবির দৃষ্টিপট এখানে তুলে ধরছি | যে মানুষটি ১০ মাস ১০ দিন আমাকে নিজের শরীরে লালন করে এই ধরার আলো দেখিয়েছেন, সেই জন্মদাত্রীর নবজাতকের প্রতি আন্তরিকতা ও স্নেহের তুলনা করা অসম্ভব | আর সেই সম্পর্কের অনুভূতি বর্ণনা করাও অসম্ভব | যেটুকু সেই জননীর মুখ থেকে শোনা তারই কিছুটা প্রকাশ করার ইচ্ছা করছি |

যে সময়ে শিশুদের খেলাধুলোর বয়স, সে বয়সে আমার মা ব্যস্ত হয়ে যান রক্তমাংসের এক জীবন্ত পুতুলের জন্ম দিয়ে তার পরিচর্যা করার কাজে | দেখা গেছে পরিবারের প্রথম শিশু মর্ত্যে পদার্পণ করা থেকেই তার জ্ঞানের নাড়ি পুরো সচেতন | সে জন্মের প্রথম থেকেই মাতৃদুগ্ধ পানে এবং পরবর্তীতে গরুর দুগ্ধের প্রতিও অনিচ্ছা প্রকাশে পরিবারের সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছে | সকলের মিনতি, সাধ্য সাধনা,

শারীরিক জোর প্রয়োগ, ঘন্টা, বাঁশি, ও নানান বাদ্যযন্ত্র দ্বারা মনোরঞ্জনের সকল কলাকৌশল কোনটাই ফলপ্রসূ হয়নি | সকলের আহ্লাদের পাত্রী সে | সে না খেলে যেন পুরো পৃথিবীই অভুক্ত থাকবে! আহা, তা হবে নাই বা কেন – সে যে বাড়ির প্রথম সন্তান | তবে মনে হয় এই যুদ্ধে তারস্বরে চিৎকারে বিজয় হতো সেই একরত্তি শিশুটিরই | মায়ের কাছেই শোনা যে যখন প্রথম সেই শিশু হামা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন নাকি তার বাবা কাপড়ে তুলো ভরে সেই আদরের শিশুর হাঁটুতে বেঁধে দিতেন যাতে মেঝেতে ঘষা লেগে হাঁটুতে না আঘাত লাগে | এমন আজগুবি কথা কি কেউ কখনো শুনেছে?

আমার জন্মের দু'বছর পরই পুত্র সন্তানের কামনায় মায়ের কোলে জন্ম নিল আমার ভাই, আর আমি মায়ের বিছানাচ্যুত হয়ে বালিকা পিসির পাশে স্থানান্তরিত হলাম | তৎপর সেই পিসি আমার সাধ আহ্লাদ পূরণের কারণে আমার বন্ধু হয়ে যান | বছর দেড়েক পুরতেই আমার জন্মদাত্রী তৃতীয় সন্তানের জননীর পদে উন্নীত হলে দেড় বছরের ছোট্ট ভাইটিকেও কাকার বুকে রাতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'ল | বলা বাহুল্য এর সবটাই মা, পিসি, কাকাদের বর্ণিত ছোটবেলার স্মৃতিকথা | এসব শুনে মনে হয় সন্তানের জন্ম দেওয়াই ছিল বিবাহিত জীবনের মূল উদ্দেশ্য | এ বিষয়ে গর্ভধারিনীর মত প্রকাশের কোনো সুযোগ দেওয়া হতো বলে মনে হয় না |

শিশু পালনের পুরো দায়িত্ব আমার মায়ের হাতেই ছিল, যা তিনি একাগ্রচিত্তে নিষ্ঠার সাথে মেনে চলেছেন | সে ব্যাপারে কারো দ্বিমত শোনা যায়নি | বাবার পরিবারের সবার ওপর মায়ের কড়া নির্দেশ ছিল যে কেউ তাঁর সন্তানের সাথে গ্রামের প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে পারবে না | একদিন আমার মুখে তিনি এক প্রচলিত গালি 'পাজি' শুনতে পান | ব্যস, সর্বনাশ! আর যাবে কোথায়? আমার তো ভালমতো শাসন হ'লই, তাছাড়া যার কাছে এ গালি শেখা তার স্বীকারোক্তি না পাওয়া গেলেও তার উদ্দেশ্যে তিরস্কার সকলকেই শুনতে হয়েছিল | একথা মনে করে ভাবি যে ঘটনাটা সত্যিই বড় আশ্চর্যজনক | আমার বালিকা মা শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা বজায় রেখেও তাঁর সন্তান প্রতিপালনে নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় যা সমীচীন মনে করেছেন, সবাইকে তাই দিয়েই মানিয়ে নিতে পেরেছেন | সম্ভবত সেটা এই কারণেই যে বয়সে বালিকা হলেও শহরে পালিত কন্যা যে তিনি! নিজের জীবনে লেখাপড়ার ঘাটতি তিনি সংসার ও সন্তান পালনে পূর্ণ করার চেষ্টা করে গেছেন | তাছাড়া ইংরেজ শাসনকালে বাবার সরকারি চাকুরিতে শহুরে সামাজিকতা ও পদমর্যাদার সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়োজনে সন্তান পালনের নিয়ম কানুনে বাবাও মাকে পুরোপুরি সমর্থন করেছিলেন, সে কথাও অনস্বীকার্য | বাবার সমর্থন না পেলে কি মা শহরের আদব কায়দা, নিয়ম কানুন আমাদের শেখাতে পারতেন? আর সে কথা বুঝেই পরিবারের কেউই কখনো মায়ের নিয়মের বিরোধিতা করেননি |

আমার বছর আটেক বয়সে এক মহিলা নাচের শিক্ষকের কাছে নাচ শেখার জন্য মা আমাকে পাঠালেন | কিন্তু এর দিন দুয়েক পরই আমার গ্রামবাসী সনাতনী ঠাকুরদাদা বেড়াতে এসে মেয়ে মানুষের নাচ শেখার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিলেন | আমার মাও নাছোড়বান্দা; তিনি আমার ও নিজের গান শেখার জন্য এক মহিলা গায়িকা নিযুক্ত করলেন | তিনি আমাদের বাসায় এসে গান শেখাতেন | মা নিজে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে গান শিখতে শুরু করলেন আর রাতে সেগুলো বাবাকে শোনাতেন | বাবাকেও কখনো কখনো মায়ের সাথে একটু আধটু গলা মিলিয়ে সুর ধরতে শোনা যেত | তবে আমার গান শেখা বেশি দিন টিকল না | গানের দিদি গান শিখিয়ে চলে গেলে আমাকে নিয়ে মা হারমোনিয়াম বাজাতে বসতেন আমার শেখা গান চর্চা করাতে | সে পর্যন্ত ঠিকই ছিল | কিন্তু বাসায় আত্মীয় বন্ধু কেউ এলেই আমার গানের পারদর্শিতা শোনানোর হুকুম হতো | একবার আমার মাসিমা আসায় খেলাধুলো ছেড়ে আমাকে ডেকে এনে বসিয়ে গান শোনানোর ফরমায়েশ হ'ল | সামান্য শুনেই অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলেন, "তোমার আর গান শিখে কী হবে?" সেখানেই হয়ে গেল আমার গানের সমাপ্তি | সেই নিষেধাজ্ঞার পর আর আমার গানের দরজা খোলা হয়নি | অবশ্য পরবর্তীতে হাইস্কুলে পড়ার সময় আমার সঙ্গীতপ্রিয় মা আমাকে একটি সুন্দর সেতার উপহার করে কলকাতার এক মিউজিক অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দেন | সেইসঙ্গে বাবা, কাকা বা বান্ধবীর সাথে যাওয়া আসার ব্যবস্থাও করে দেন | নিজের জীবনের যা কিছু ঘাটতি গানবাজনা দিয়েই তিনি তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন | তিনি নিজের জন্য বাসায় এসরাজের ওস্তাদ নিযুক্ত করেন এবং বাকি জীবন নিয়মিত চর্চা করে এবং গানের

মাধ্যমেই অবসর সময়ে আনন্দ পেয়েছেন, যা বাবাও উপভোগ করেছেন | বাবার প্রয়াণের পর ওই এসরাজই ছিল মা'র মন ভোলানোর একমাত্র সঙ্গী | মায়ের সঙ্গীতে এই আসক্তির কারণ মনে হয় তাঁর পিতৃমাতৃকুলের সঙ্গীতচর্চা ও কিছু জ্ঞানীগুণী শিল্পীর অবস্থান | দুই বাংলার প্রখ্যাত নজরুলগীতি শিল্পী ফিরোজা বেগম ছিলেন আমার মায়ের আপন খুড়তুতো ও মাসতুতো বোন | মায়ের তৃতীয় কন্যা, আমার সেজবোন আখতার জাহান ঢাকা বেতার ও টেলিভিশনের নজরুল এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক প্রখ্যাত শিল্পী, যিনি পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়াবাসী হয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত, ভাওয়াইয়া ও নজরুলগীতির এক ফিউশন মিউজিকে নিজস্ব গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা | মায়ের ছোট পুত্র শখের গান ও দোতারা বাজিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্ন স্টেটে এক বয়স্ক পাগলের গ্রুপ তৈরী করে অন্যান্য সঙ্গীত পাগলদের চিত্ত বিনোদন করার জন্য সমাদৃত | আর তারই বড়ভাই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়ক, সাধক – গায়কীর রিসার্চার ও ফ্রিল্যান্স শিক্ষক হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশে যথেষ্ট সমাদৃত ও সুনাম অর্জন করেছে | তার অনেক রেকর্ডিং ইউটিউবেও প্রচারিত | ওদিকে বাংলাদেশ ও ভারতের নামকরা ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী ও স্বনামধন্য পল্লীগীতিকার আব্বাসউদ্দীন তাঁর কন্যা ফেরদৌসী রহমান ও পুত্র মুস্তাফা জামান আব্বাসী আমার মায়ের ননদ আর দেবর | আর তাঁদেরই ভাইঝি আমার ভগ্নী, নাশিদ কামাল সেই উপমহাদেশে পল্লীগীতিকারের সুযোগ্য উত্তরসূরি | আবার অন্যদিকে আমার কাকিমা, মালকা পারভীন বানু ও তাঁর ভগ্নী লায়লা আরজুমান্দ বানুর নামও অবিভক্ত বাংলার বাংলা এবং উর্দুগান ও গজলের জন্য সমাদৃত | এসব তথ্য আজ সবার সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন মনে হ'ল আমার মায়ের শিল্পী মনের উৎস ও পরিচয় বোঝানোর জন্য |

আমাদের মা তাঁর তিন সন্তানদের শুধু গান বাজনা শেখানোর প্রতিই মনযোগ দেননি, তাদের লেখাপড়ার দিকেও তাঁর সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ছিল | মনে আছে যখন বাবার সরকারি চাকুরির পোস্টিং গোপালগঞ্জে ছিল, সন্ধ্যার পর রান্নাঘরের বারান্দায় বড় হ্যাসাক বাতি ঝুলিয়ে উল্টোদিকে বাসার অন্দর মহলের চওড়া বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে, আরো লণ্ঠন কিংবা মোমবাতি জ্বালিয়ে মা আমাদের তিন ভাইবোনকে পড়াতেন | বড় দুই ভাইবোনকে বয়স অনুযায়ী পড়ানোর সময় ছোট বোনটি পাশে বসে যা বুঝত তাই আওড়াত | এরপর বাবার কুমিল্লায় পোস্টিং হ'ল | আমার ৯ বছর বয়স হলে আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে আর আমার থেকে দু'বছরের ছোট ভাইকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তৈরী করে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন |

আমার ১৩/১৪ বছর বয়স থেকেই পড়ালেখার পাশাপাশি মা ঘরে তৈরী পরিধানের ট্রেনিং দেওয়া শুরু করেন | যুদ্ধের সময় রেডক্রসের অনুরোধে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর জন্য মা মাসিরা উলের সোয়েটার, টুপি, মোজা তৈরী করে দিয়েছেন (আমিও সেসব শিখে আজও বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের জন্য বানিয়ে অবসর সময় কাটাই)| প্রতি শনি ও রবিবার মা আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা নাকচ করে রান্নাঘরে ডিউটি করতে পাঠিয়ে দিতেন রাঁধুনির কাছে সাধারণ ও পোশাকি রান্না শেখার জন্য | সেসব আমার ভীষণ অপছন্দ ছিল | কিন্তু সে ডিউটি থেকে ছাড় পাওয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না | আমার যুক্তি – চাকরি করলে তো রান্নার লোক রাখা যাবে; তার উত্তরে মায়ের যুক্তি ছিল, "তুমি রান্না না জানলে কাজের লোককে কীভাবে পছন্দের রান্না শেখাবে?" তার বিপক্ষে জবাব আমার ছিল না | মোট কথা রান্না শেখার কোনো বিকল্প চিন্তাই তিনি মানতে রাজি ছিলেন না | কাজেই সব ধরনের রান্না মোটামুটি শেখা হ'ল, তবে আমার দূরদর্শী মা'র বাঙালির রোজকার ভাত-ডাল রাঁধা আর রুটি বেলার ট্রেনিং-এ ফাঁক রয়ে গেল | ভাত, ডাল আর রুটির দায়িত্ব সেই কাজের মেয়ের জন্যই রইল | তাই বিবাহোত্তর সাংসারিক জীবনে ঢুকে বোঝা গেল, "বাপুরে, কত ধানে কত চাল হয়!"

কাজকর্মে ভুল হলে মা'র কাছে বকাবকি শুনেছি ঠিকই | বাবা তো তাঁর নন্দিনীদের মৌখিক তিরস্কার কখনো করেননি | তাঁর সামান্য অপছন্দের দৃষ্টিই ছিল আমাদের জন্য যথেষ্ট | শাসন করার দায়িত্ব সবটাই ছিল মায়ের | আর মায়ের কড়া শাসনের পর কন্যাদের অভিমান ভাঙানোর ভার বাবার | বাবার চমৎকার দর্শনের কথা – অন্দর মহলের ভার মেয়েদের আর বাইরের জগৎ সামলানোর কাজ পুরুষের | মানে ডিভিশন অফ লেবর |

পিতৃগৃহের শিক্ষা ও ট্রেনিংয়ের ফলাফল বোঝা যায় বিবাহোত্তর অপিরিচিত সংসারে প্রবেশের পর | শ্বশুরের বাসায় বিবাহের পরদিন সকাল থেকে সবাই যে যার দায়িত্বে ব্যস্ত | সে

সময়ের নিয়মানুযায়ী ভাড়া করা বাবুর্চিরা এসে হৈচৈ তোড়জোড় করে বাগানের এক অংশের কিছু গাছপালা পরিষ্কার করে, মাটি খুঁড়ে দুটো চুলো তৈরী করে বৌভাতের রান্না শুরু করে দিল।

আজকের সমাজে বাণিজ্যিক সাজঘরের প্রচলন তখন ছিল না। সেদিনের নিয়মে আমাকে বাসাতেই সাজগোজ করিয়ে মাঝের বড় ঘরে পাতা বিছানার উপর বসিয়ে দিল। এমন সময় আমার বর ঘরে ঢুকে মন্তব্য করে উঠলেন, "আরে, তুমি বসে আছ কেন? সবাই কাজ করছে; তুমিও ওদের সাথে কাজ করো, নাহলে বদনাম করবে তো সবাই!" আমার ননদ সেকথা শুনে হৈ হৈ করে উঠল, "আহা দাদা, আপনি কী বলছেন? বৌদি তো আমাদের নতুন বৌ।" শাশুড়িও ননদের সাথে সায় দিলেন, "ঠিক আছে। বৌমা সময়মতো সবই করবে।" ভাবলাম বাঁচা গেল। শাশুড়ি আমার পক্ষে। তবে বরের কথা শুনে আমি তার মান রাখতে ননদকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী করতে হবে বলো, আমি করছি।"

- "আরে, তুমিও যেমন, দাদার যত পাগলামি।" বলে ননদ উঠে গিয়ে এক কুলোভর্তি ধোয়া পানপাতা, তার পাশে এক ছোট বাটিতে চুন, আরেক ছোট প্লেটে ছোট ছোট করে কাটা সুপারি এনে আমার সামনে রেখে বলল, "নাও, তুমি নাহয় বসে বসে পানের পাতাগুলোতে চুন মাখাও।"

এ আর এমন কী কাজ! হাত ধুয়ে একেকটা পানের পাতার চকচকে দিকে চুন মাখিয়ে সুন্দর করে কুলোয় বিছিয়ে রাখলাম। আমার কাজ শেষ হলে ননদ ঘরে ঢুকে পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "এ তুমি কী করেছ? পানের উল্টোপিঠে চুন সুপারি ভরতে হয়। তুমি মনে হয় কখনো পান বানাওনি।" শুনে দারুণ লজ্জা পেলাম। হায়রে, শ্বশুরবাড়ির প্রথম কাজেই এমন মারাত্মক ভুল করে ফেললাম! আমার কী দোষ! আমি কি কখনো পান বানিয়েছি, না খেয়েছি, না খেতে দেখেছি যে পাতার উল্টোদিকে চুন মশলা ভরতে হয় জানব? আমার বাপের বাড়িতে কারো পানের নেশা ছিল না, কাজেই মা আমাকে পান বানানোর ট্রেনিং দেওয়ার চিন্তাও করেননি। তা এখন কী আর করা; আবার কী? ডবল খাটুনি। বসে বসে পান পাতার চকচকে পিঠের চুন মুছে নতুন করে ভেতরের পিঠে চুন লাগাও। নতুন বরও অল্পবয়সী বৌয়ের পারদর্শিতা দেখে নিশ্চয়ই বেশ উপভোগ করল! ওদিকে আমার ননদ আর পিসতুতো এক দেওর এসব কান্ড দেখে হেসে কুটোপাটি। শাশুড়িমা নতুন বৌয়ের আনাড়িপনা দেখে মুচকি হেসে আমার লজ্জা বাঁচাতে মন্তব্য করলেন, "ঠিক আছে, বৌমা আগে কখনো এসব কাজ করেনি তো, আস্তে আস্তে শিখে নেবে সব।"

মা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের দেশের পারিবারিক নিয়মানুযায়ী সাংসারিক যেসব কাজ গৃহিণীর শেখা প্রয়োজন সেগুলোরই ট্রেনিং দিয়েছিলেন। অন্য পরিবারে বা বিদেশে গিয়ে কী ধরনের কাজ সামলাতে হবে সে চিন্তা তাঁর মনে আসেনি। বিদেশবাসীরা ক'জন দেশে নিজে হাতে উনুন ধরিয়ে রান্না করেছেন জানি না, আমি কিন্তু এ ব্যাপারে পুরোপুরিই আনাড়ি ছিলাম। কাজের মেয়েরাই তো ওসব কাজ করে দেয়। প্রথমে কাঠ, পরে কয়লা, তারপর কেরোসিনের চুলো তো ঐ মেয়েরাই জ্বালিয়ে আমাদের রান্না করতে ডেকেছে। গ্যাস এসেছে আরো অনেক পরে। ষাটের দশকে দেশ ছেড়ে বিদেশে পড়তে এসে নিরুপায় আমার গ্যাসের চুলো জ্বালানোর হাতেখড়ি। ভাত-ডাল রান্নারও হাতেখড়ি এই পশ্চিম দেশের রান্নাঘরেই। আর শিলপাটায় মশলা বাটাও কখনো শেখার প্রয়োজন হয়নি। বিদেশে গুঁড়ো মশলা বা ব্লেন্ডারের দৌলতে শীল পাটার প্রয়োজন হয় না। তবে পেঁয়াজ ও আদা রসুনের গুঁড়ো ব্যবহার করার ইচ্ছে আমার হয়নি, কারণ ফ্রেশ মশলার স্বাদই যে আলাদা!

মায়ের হাত ধরে শেখা নানান বিষয়, ঠেকে শেখা সবই আমার অভিজ্ঞতার অঙ্গ। এই হ'ল আমার মায়ের মাতৃত্বের অবদানের গল্প।

মঙ্গল শোভাযাত্রা ও মৌলিক দর্শন

শেলী শাহাবুদ্দিন

মঙ্গল শোভাযাত্রা নাকি হিন্দু সংস্কৃতি | মঙ্গল শব্দের কারণে | মুসলিমদের জন্য মহা বিপদের বিষয় | বাঁচার উপায় কী? তাহলে মঙ্গলবারকে আমরা এখন থেকে বলব অমঙ্গলবার | মঙ্গল তখন হিন্দু না হয়ে অহিন্দু হবে | মঙ্গল গ্রহকে বলব অমঙ্গল গ্রহ | 'তোমার মঙ্গল হোক' না বলে বলব, 'তোমার অমঙ্গল হোক |' তা সে আমার যতই প্রিয়জন হোক | মঙ্গলময়কে আমরা প্রকৃত মুসলমানরা বলব অমঙ্গলময় |

ব্যাকরণবিদরা বলবেন অর্থটা তো উল্টে যাবে | স্রষ্টা হয়ে যাবেন শয়তান | আমরা, প্রকৃত মুসলমানরা তা মানব না, কারণ বাংলায় ব্যাকরণ বিষয়টাই হিন্দু সংস্কৃতি | ওই যে, ব্যাকরণতীর্থ, ব্যাকরণরত্ন, এইসব কী? এঁরা ছিলেন সব টোলের শিক্ষক | সব হিন্দু | নাস্তিক তরুণরা বলবে সব ভাষাতেই তো ব্যাকরণ আছে | তারা কি সবাই হিন্দু? নাস্তিক গাধাদের বলি, বাংলাভাষা ছাড়া কোথাও ব্যাকরণ নেই | যেমন ইংরেজদের আছে গ্রামার | ওটা ব্যাকরণ নয় | কারণ গ্রামার শব্দটির মধ্যে তুমি কোন হিন্দু গন্ধ পাবে না | হিন্দু গন্ধ মানে হিন্দু সংস্কৃতি | সেটা ফুল হলেও হিন্দু ফুল | তার সুগন্ধ যত ভালই হোক |

ভাল কথা, বাংলার মাটি ছাড়া যেসব ফুল কোথাও পাওয়া যায় না, এরাও তো তাই হিন্দু | যেমন কদম ফুল, বকুল ফুল | বর্ষাকালে এদের শরীর থেকে যে মোহময় গন্ধ বাতাসে ছড়ায়, সেটা মুসলমানের নাকে গেলে ঈমান থাকবে না | মুসলমানের উচিত হবে তখন নাকে একটা ক্লিপ লাগিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া |

খাবারের বেলায়ও তাই | যেমন ল্যাংড়া আম | কি অশ্লীল শব্দ! তাতেই তো প্রমাণ হয় ফলটা পুরোপুরি হিন্দু | খেতে যত ভালই হোক | বাংলার হিন্দু মাটি ছাড়া পৃথিবীর কোথাও ল্যাংড়া বাঁচে না | এরকম আরো আছে | ইলিশ মাছ, কৈ মাছ, ইত্যাদি | এসব হিন্দু মাছ | বাঙালি এসব খায় আবহমান কাল থেকে | ইলিশ বাংলার নদী ছাড়া কোথাও তেমন ভাল হয় না | ইলিশ ভাজার গন্ধ অতিরিক্ত হিন্দু গন্ধ | ঈমান থাকে না | বাংলার আশেপাশে সামান্য যা ইলিশ হয় (যেমন বর্মায়) সেগুলিও হিন্দু মাছ | তবে বর্মার ইলিশের স্বাদ আর হিন্দু গন্ধ অনেক কম | সেগুলি খাওয়ার পরে তৌবা করলে সম্ভবত আবার মুসলমান হওয়া যায় |

প্রকৃত মুসলমানের উচিত সকল মিঠা পানির মাছ বর্জন করে বেশি করে গোস্ত খাওয়া | তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুসলিম প্রাণী উটের গোস্ত | বাংলাদেশে মুসলিম এনজিও এবং ছদ্মবেশী জঙ্গি সংগঠনগুলির উচিত উটের ফার্ম করে দেশে উটের গোস্তের সরবরাহ নিশ্চিত করা | মুসলমানরা মাছ খেতে চাইলে সমুদ্রের মাছ খেতে পারে | তারা বাংলার নয়, তাই তারা সবাই মুসলিম মাছ | অক্টোপাস, হাঙ্গর, স্টিংরে, কাঁকড়া, এমনকি জেলিফিশ খেলেও মুসলমান মুসলমানই থাকবে | হিন্দু হয়ে যাবে না | আলহামদুলিল্লাহ |

আমরা মঙ্গল শোভাযাত্রা কতল করব | তারপর পর্যায়ক্রমে কদম ফুল, বকুল ফুল, ল্যাংড়া আম, কৈ, ইলিশ, ইত্যাদি সকল অমুসলিম সংস্কৃতি কতল করব | বাংলাকে আমরা মুসলমান বানিয়ে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ | রবীন্দ্র নজরুলের বাবার সাধ্য নেই আমাদের থামায় | "আমরা সবাই তালিবান, বাংলা হবে আফগান |"

আমি টেবিলের ওপর, টেবিল মাটির ওপর, তাই আমি মাটির ওপর | এটা মৌলিক দর্শন |

সেইরকম, মুসলমান আসার আগে থেকে বাঙালি বাংলাভাষা বলত | তারা সব ছিল হিন্দু (বৌদ্ধ ইত্যাদি আমরা মানি না, সব শালা হিন্দু)| এরপর যে বাঙালিরা মুসলমান হয়েছে, তারা প্রকৃত মুসলমান হবে তখনই যখন তারা উর্দু বা আরবি বলবে | আর হিন্দি যেহেতু শুনতে প্রায় উর্দুর মতোই, তাই হিন্দি বললেও তাকে আমরা প্রকৃত মুসলমান বলে ধরে নেব | মোট কথা দেখতে শুনতে যা কিছু অবাঙালি মতন, সেটাই প্রকৃত মুসলমানের চিহ্ন | দেখতে শুনতে যা কিছু বাঙালির মতো, তাই হিন্দু | সে কারণেই বাঙালি মেয়ে শাড়ি পরলে হিন্দু, আর শাড়ি ছাড়া অন্য যা কিছু পরুক, সে প্রকৃত মুসলমান | প্রকৃত বাংলা বললে তুমি প্রকৃত হিন্দু | সে কারণেই মঙ্গল শব্দ হিন্দু |

আমি টেবিলের ওপর, টেবিল মাটির ওপর, তাই আমি মাটির ওপর | মৌলিক দর্শন |

শৈশব স্মৃতি

শ্যামল মজুমদার

১৯৬০ সালে শান্তিনিকেতনে একটি আট (বা নয়) বছরের শিশুর পদার্পণ | রবি ঠাকুরের নাম দেখেছে সে বইয়ের পাতায় জনগণমন সঙ্গীতের রচয়িতা হিসাবে | আরো কিছু কবিতা সে পড়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে আরো অনেক কবি সাহিত্যিকরাও আছেন | কলকাতার ইস্কুলে সে মোটেও সুবিধে করতে পারছে না তাই নতুন পাঠশালার খোঁজ | কলকাতা তার মা-বাবার সুখী গৃহকোণ নয়, আত্মীয়ের বাড়িতে কি মায়ের ছোঁয়া মেলে? ঝরিয়ার কয়লাখনি অঞ্চলে তার জন্ম | মায়ের কাছেই লেখাপড়া | বাবার ইচ্ছায় কলকাতা শহরে ইস্কুলে ভর্তি | সেখানে চড় চাপড়, মারধোর সবই চলে | কিন্তু শক্ত শক্ত ইংরেজি কবিতাগুলি কিছুতেই মুখস্থ হয় না | পরপর দুবার ফেল; অতঃপর শান্তিনিকেতনে, যেখানে লেখাপড়ার চেয়ে গাছে চড়ার প্রাথমিকতা, সব রকমের বাঁদরামির স্বাধীনতা |

আমার একটা সন্দেহ কোনোদিন মিটবে না যে আমার জন্মদিনটা এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫১-র জায়গায় ১৯৫২ হ'ল কেন | পরিণত বয়সে পেছন ফিরে তাকিয়ে অনুমান হয় যে আমার কলকাতার স্কুলের ফল দেখে ১৯৬০ সালে, ন'বছর বয়সে, কাশীনাথদা ক্লাস ফোরে ভর্তি করাটা সমীচীন বোধ করেননি | তাই বাবার সঙ্গে মিলিত ষড়যন্ত্রে আমার নয় বছর বয়সটি আট বছরে নামিয়ে ক্লাস থ্রিতে নেওয়া হয় | এখনো আমি বয়সানুপাতে স্বল্পবুদ্ধি |

প্রথম বিনিদ্র রাত কাটল সবেধন গেস্ট হাউসে, মশাদের সম্মিলিত শত্রুতায় | পরদিন ভোরে ভীরু কুণ্ঠিত পদচারণায় আশ্রম প্রদক্ষিণ বাবা মা'র হাত ধরে | বেশ নতুন একটা আবেশ, লাল কাঁকুড়ে পথ, গাছগাছালি, সবুজের সমারোহ, কত ফুল, জীবনেও দেখিনি | সম্মোহনী এক আবেগে আবিষ্ট হয়ে পড়ছি তিনজনেই | আমার মাথায় কিন্তু ঘুরছে একটা ভয়ানক চিন্তা | হস্টেল | সেকথায় পরে আসা যাবে'খন |

চৈতি (চৈত্য) পেরিয়ে, কিচেনের সামনে দিয়ে, খেলার মাঠ বাঁহাতে রেখে এগোচ্ছি | শ্রীসদন, যেখানে আমার পিসিমণি (শ্রীযুক্তা মঞ্জুশ্রী মজুমদার) থেকে গেছেন এককালে, পেরিয়ে যেতেই এক অভাবনীয় দৃশ্য | ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেব, অনতি-

দূরে সুজাতা | পারিপার্শ্বিক গাছপালার মতো তাঁরাও উদ্ভিন্ন | Landscape sculpting বোঝার মতো বোধবুদ্ধি তখন আমার ছিল না, তবে এই ধরনের স্থাপত্যশিল্পকে এই নামে অভিহিত করা যায় কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই | প্রাথমিক সম্মোহনের আচ্ছন্নতা উত্তীর্ণ হয়ে দেখলাম পেছনে কালোবাড়ি; তার দেওয়ালে উৎকীর্ণ ছবি | আমার শৈশবের এই বিস্ময়াঘাতের সঠিক পরিভাষা এই পরিণত বয়সেও খুঁজে পাচ্ছি না | কিন্তু এই স্মৃতি এতদিনেও অমলিন | এক স্বপ্নপ্রায় অসম্ভব অবাস্তব পৃথিবী |

একটু বেলায় পাঠভবনের অফিসে কাশীনাথদার ঘরে যাওয়া হ'ল | প্রভাকরদার হাত ধরে তেজেশদার কাছে বাংলা, প্রদ্যুৎদার কাছে অঙ্ক ও ললিতদার কাছে ইংরেজি পরীক্ষা দিতে গেলাম | ক্লাস চলাকালীনই পরীক্ষা পর্ব হ'ল এবং কী যাদুতে জানি না উত্তীর্ণও হয়ে গেলাম | তাঁরা খুবই সদাশয় স্নেহময় ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য | এবার হেডমাস্টার মশাই স্বয়ং পরীক্ষা নেবেন | কাশীনাথদা গুরুগম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, "গাছে চড়তে পারো?" ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়ে বলি, "না" |

- "কাঁচা আমের খোসা ছুলতে পারো?"

পুনরায় "না" বলতেই তিনি বলে উঠলেন "তাহলে তো এখানে ভর্তি করা যাবে না |" বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন, পরে বুঝেছি আমার পরীক্ষার সময় তিনি এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের চরিত্র বেশ কিছুটা বুঝে নিয়েছিলেন | আমি তো একান্তই নাবালক, কিছুই বুঝতে পারিনি | পরমুহূর্তেই অধ্যক্ষ মহাশয় ছদ্মগম্ভীর প্রশ্ন করলেন "শিখে নিতে পারবে তো?" আর না বলি! ঘাড়

দুলিয়ে বলি "হ্যাঁ...|"

- "তবে তো হয়েই গেল | কিন্তু খবরদার, পকেটে যেন ব্লেড দেখতে না পাই, pen knife রাখবে |" রূপকথার মতো শোনাচ্ছে না? আরো আছে |

বাড়ি ফিরে গেলাম | বাক্স-বিছানা, ধুতি-পাঞ্জাবি-জামা-প্যান্ট, সাবান-মাজন-টুথব্রাশ ইত্যাদি কেনা হ'ল | কী আনন্দ, সব নতুন সামগ্রী আমার | শিহরণ! ঘুম আসে না চোখে, কী হবে, মাকে ছেড়ে থাকতে কি পারব? মা না বেড়ে দিলে কী খাব? হস্টেল কি ভিন্ন নামের বন্দীশালা? বদ ছেলেদের সায়েস্তা করতে মা-বাবারা সেখানে পাঠিয়ে দেন? বাবাকে প্রশ্ন করা সাধ্যাতীত ছিল, মা আমারই মতো চিন্তামগ্ন | মাঝেমাঝেই হাসিমুখে সান্ত্বনা দিচ্ছেন কিন্তু সে কথাগুলি যেন আন্তরিক মনে হচ্ছে না! আমার এবং নিজের, দুজনেরই মন ভোলাচ্ছেন কি?

কাকার সঙ্গে গন্তব্যে পৌঁছালাম | কণামাসিমা আমার বাক্স-বিছানা ইত্যাদি বুঝে নিলেন | তারপর কাকা আমার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে আদর করে ধীরে পিছু ফিরলেন | যতদূর তাঁকে দেখা গেল আমি স্থানুবৎ চেয়ে রইলাম | কাঁদিনি | ভেতরটা ভয়-বিহ্বলতায় ঝড়ের প্রাক্কালে শান্ত, স্তব্ধ সমুদ্রের রূপ নিয়েছিল বোধহয় |

চতুর্দিকে কোলাহল, কিন্তু আমি নীরব স্থবির | পরের করণীয় যে কী তা ঠাহর করতে পারছি না | হঠাৎ একটি ছেলে বলে উঠল "দেখ দেখ, আমার এই বোতলের ছিপিতে জল ছিল, যেই না একটা পোকা তাতে পড়ল অমনি জলটা নীল হয়ে গেল!" বেশ কিছু ছেলে জুটে গেল ম্যাজিক দেখতে, আমিও | সবাই কি বোকাটাই হলাম যখন বোঝা গেল যে ছিপিটাতে জল মেশানো সুলেখা কালিই ছিল, একটা মাছি তাতে পড়েছে | চিত্তর মাথাটা ছিল অতিমাত্রায় উর্বর, দুষ্টুবুদ্ধিটা তৎক্ষণাৎ তার মাথায় খেলে গেল আর সবাইকে বোকা বানিয়ে সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল | কিন্তু আমি সব দুঃখ মনখারাপ ভুলে সেই যে মিলে গেলাম আর কোনোদিন ফিরে তাকাতে হয়নি |

প্রথম রাত্রে সন্তোষালয়ে একা শুতে হ'ল | শেষরাতে পপাত ধরণীতল | জমাট আঁধারে কিছুই ঠাহর করতে না পেরে বার দুই দেওয়ালে মাথা ঠুকে, মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়লাম | আলো ফুটতে না ফুটতে শুনি জোর কোলাহল, 'কোথায় গেল, কোথায় গেল, নতুন ছেলে, পালিয়ে গেল নাকি, খোঁজ খোঁজ |' ভয়ে ভয়ে মুন্ডুটা বাইরে আনতেই মণীন্দ্রদা ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন | মাসিমা পাংশু মুখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, প্রচুর বাবাবাছা করলেন | সেদিন রাত্রে তিনি আমায় তাঁর ঘরে আরেকটি খাটে নিয়ে শুলেন | সেই খাটে আবার রেলিং দেওয়া ছিল | রাতে কয়েকবার উঠে তিনি আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলেন আমি স্বস্থানে আছি কিনা | কিছুদিন এইমতো চলার পর আমাকে আবার ডরমেটরিতে ফেরৎ পাঠানো হ'ল | রেলিং আরো কিছুদিন চালু ছিল, কবে খুলে দেওয়া হয়েছিল এখন আর মনে নেই |

গ্রীষ্মকালে শান্তিনিকেতনে ভয়াবহ লু বইত; দিবানিদ্রা আবশ্যিক ছিল | ধনপতিদার কঠোর আদেশে আমরা সবাই যে যার খাটে শুয়ে পড়তাম ও চোখ চিপে বন্ধ রাখতাম | ধনপতিদা পায়চারি করতেন সামরিক কায়দায় | আধঘন্টা পর যখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে সবাই নিদ্রিত তখন তিনি নিজ কক্ষে বিশ্রাম নিতে যেতেন | কিছু পরে চিত্ত উঠে পা টিপে টিপে উঁকি মেরে দেখে আসত ধনপতিদার নাসিকা গর্জন শুরু হয়েছে কিনা | সন্তুষ্ট হয়ে সে আমাদের ইশারা করলেই আমরা চুপিসাড়ে জানালা টপকে একছুটে আম্রকুঞ্জে পছন্দসই গাছে উঠে কাঁচা আম সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম | কিন্তু প্রথমদিনেই বিপর্যয় | চোখে দূরবীন নিয়ে সাইকেলে চড়ে শালবীথিতে কাশীনাথদা আমাদের পাকড়াও করলেন | সবাইকে নিয়ে গিয়ে ধনপতিদার হাতে প্রত্যার্পণ | আমরা, যাকে বলে পুনর্মূষিকভব | বৈকালিক জলখাবার খেতে যাওয়ার আগে ধৃত আবাসিকদের ডেকে এক এক করে কানমলা দিলেন | তারপর কিচেন আর খেলার মাঠ | এই খেলার মাঠ আমাকে ও আমাদের যা আনন্দ দিয়েছে তার তুলনীয় আর কিছুই এ জীবনে পাইনি | অসুস্থতা ছাড়া কোনোদিন খেলার মাঠে অনুপস্থিত হইনি |

কণামাসিমার কথা বলে শেষ করা যাবে না | আমার বিশেষ অধিকার ছিল দ্বিপ্রহরিক বিশ্রামের সময় তাঁকে বাংলা খবরের কাগজ পড়ে শোনানো | মাঝে মাঝেই ডাক পেতাম ভাতের মাড় নুন লেবু সহযোগে পান করার জন্য | কোনোদিন ডালের জল | বারণ ছিল বাড়িতে জানানোর, বলতেন – তাঁরা কী ভাববেন! যেন খুব লজ্জার বিষয় ছিল এসব | নরাধম আমি তালগাছে, নারকেলগাছে চড়ার জন্যেও ডাক পেতাম | পরে তালের বড়া, নারকেল নাড়ু পেতাম | রোজ ভোরে তাঁর পূজার

ফুল তুলে আনতে হতো | বিনিময়ে ভাল ভাল কত যে গল্প শুনেছি | প্রথমবার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে দেখে তাঁর কি অনুভূতি হয়েছিল, ইত্যাদি | একবার সৈয়দদাকে (মুজতবা আলী) নিমন্ত্রণ করে সামনে বসিয়ে খাইয়েছিলেন, আমরা চারদিকে ঘিরে বসে সৈয়দদার ছুঁড়ে দেওয়া খুনসুটি উপভোগ করছিলাম | মাসিমা ঘোমটার নীচে সলজ্জ আতিথেয়তা করছিলেন ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে আমাদের নির্দেশ দিয়ে |

রাতে শুতে যাওয়ার আগে রোজই পা ধুয়ে বিছানায় যেতে হতো মাসিমা ও মণীন্দ্রদার যুগল তত্ত্বাবধানে | শীতকালে বিশেষ ব্যবস্থা: উষ্ণ সাবানজলে প্রত্যেকের পা ধুইয়ে, মুছে, তেল মাখিয়ে দিতেন মাসিমা নিজের হাতে | তারপর শুতে যাওয়া | কী অত্যাচারী মহিলাই যে ছিলেন ভাবা যায় না!

সকালবেলায় আরেক বিপদ | প্রাতরাশের লাইনে রোজকার মতোই সবাই দাঁড়িয়ে | ক্যাপ্টেনের হাতে বাটি, তাতে গ্লিসারিন নিয়ে সে সকলের সামনে আসবে আর ধনপতিদা প্রত্যেকের মুখে তা জেবড়ে মাখিয়ে দেবেন | ডিক্টেটররাও এত নির্মম হতেন কি? রাখী পূর্ণিমার দিন তিনি সকলের হাতে একটি হলুদ সুতো বাঁধতেন | সরলতম আন্তরিক ছিল সেই স্নেহবন্ধন, আজ এইসব মনে করতে গিয়ে গলা ধরে উঠছে, চোখ বাষ্পায়িত হচ্ছে কেন কে জানে! মন্দিরে ধুতি পরে যাওয়ার নিয়ম, কে পরিয়ে দেবেন, কেন, ধনপতিদা | রায়বেশে নাচের ধাঁচে সেই ধুতি পরিধান, আজও তাই পরি | খুলে যাবার ভয় নেই, হোঁচট খাবার সম্ভাবনা নেই, দৌড়তেও পারা যায়, খেলাও যায়, কুস্তিও করা যায় | কোঁচা দোলানো বাবুয়ানাটুকুই হয় না | ধনপতিদার যুবক পুত্রের নাম অরূপ লাহা | তাঁর সঙ্গে আমাদের অসমবয়স্ক বন্ধুত্বে কোথাও কোনো বাধা ছিল না | আমরা তাঁর পেছনে লাগতাম ছড়া কেটে "অরূপ লাহার, টেরির বাহার" ইত্যাদি, আর তিনি আমাদের তাড়া করতেন |

আরেকটি বিশেষ সুখস্মৃতি – প্রতিবছর শিক্ষাভবনের ছাত্রদের সঙ্গে শিশুবিভাগের ছেলেদের একটা ক্রিকেট ম্যাচ হতো, টেনিস বলে | তারের পাপোষ দিয়ে উইকেট হতো | সন্তোষালয় আর শালবীথির মাঝখানে পিচ তৈরিই ছিল, আমরা তো খেলতামই | শিশুবিভাগের ছেলেরা মাঝে মধ্যে জিতেও যেত | কী অনাবিল আনন্দের দিন ছিল সেসব!

বিকেলে খেলার মাঠ থেকে ফিরে সান্ধ্য উপাসনায় বসতে হতো | ধনপতিদা পৌরহিত্য করতেন | তারপর স্টাডি | এই ছিল প্রাত্যহিক রুটিন | এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় আকস্মিক আগমন বীরুদার (অমিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর)| চারিদিক পর্যবেক্ষণ করে আমাকে ডেকে নিলেন | ধনপতিদার অনুমতি নিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন সম্ভবত মুকুটঘরে | মহড়া চলছে রাসধারী নাটকের | চন্দ্রোদয়দা রাসধারীর ভূমিকায়, সাগর ভালুক, মণিদি রাণী, আমি নুলো রাজপুত্র | আরো কারা ছিলেন মনে পড়ছে না | পরদিন থেকে সারা আশ্রমে যেখানে সেখানে বীরুদা আমাকে দেখলেই নুলো নুলো বলে ডাকতে লাগলেন | আমি সেই নামেই কুখ্যাত হয়ে গেলাম | নাটকটি হয়েছিল পুরনো লাইব্রেরির বারান্দায় |

কোনো একদিন এরকমই সন্ধ্যায় প্রসেনজিৎদা এসে ধরে নিয়ে গেলেন | গান শেখাতে লাগলেন | কত গান যে শিখলাম | এমনি সব খামখেয়ালি মানুষে ভরা ছিল আশ্রম | অশোকবিজয় রাহা হস্টেলেই নালক পাঠ শেখালেন, বুদ্ধদেব স্মরণে অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য (উপলক্ষ্য মনে পড়ছে না); যদিও শেষ অবধি সেই অনুষ্ঠানে আমি অংশগ্রহণ করতে পারিনি, অসুস্থতার কারণে |

শিক্ষক অধ্যাপকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আমাদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি; তাঁদের আচরণ, সহজ অভিভাবকত্ব এই শ্রদ্ধাকে স্বয়ংসম্ভব করে | আজও তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা নতমস্তক হই বিনা প্ররোচনায় | তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো শিক্ষক, কখনো বন্ধু, কখনো অভিভাবক; দুঃখে দুখী, সুখে সুখী পরমাত্মীয় ছিলেন |

পাঠভবনে গান শিখতাম মঞ্জুদি ও কুট্টুদির কাছে | বড় বয়সে সিতাংশুদা | কখনো ক্ষমাদিও শিখিয়েছেন | প্রথম শেখা গানগুলি ছিল, তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি আমাদের পিতা, গানগুলি মোর শৈবালেরই দল, আমার সোনার হরিণ চাই, শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন, শিউলি ফুল শিউলি ফুল ইত্যাদি...| আশ্রমের আকাশে বাতাসে যেসব গান ভেসে বেড়াত তা থেকেও কত গান এমনি এমনি শুনে শুনেই শিখে নিয়েছি | সকালের বৈতালিকে গানের দলে গেয়েছি | শেষ বছর সঙ্গীত ভবনে বীরেনদাও শিখিয়েছেন |

বাংলা পড়াতেন মলিনাদি, উমাদি এবং সুবীরদা, পরে বড় ক্লাসে নলিনীদি, অমিত্রসূদনদা, অনঙ্গদা। অনাথদা পড়াতেন স্বামীশিষ্য সংবাদ। লেবুদার কাছে পড়া হয়নি আমার।

ইংরেজি পড়াতেন বুবুদি, পরে কল্যাণীদি, বিকাশদা, জীবনদা ও সমীরণদা। অ্যান্টনিদা এবং অলিভারদার কাছেও শিখেছি। ললিতদার কাছে আমার পড়ার সুযোগ হয়নি।

অঙ্ক শেখাতেন কাশীনাথদা, প্রদ্যুৎদা, নিরঞ্জনদা, বিশ্বনাথদা, সুরেশদা, শৈলজাশঙ্করদা। খেলার মাঠে সুবোধদা ছিলেন অবধায়ক, তিনি আমাদের অঙ্কের ক্লাসও নিয়েছেন। সুরেশদা ইংরেজিও পড়িয়েছেন।

সংস্কৃত পড়াতেন প্রতিভাদি, যুথিকাদি। নন্দিতাদির কাছে শেখা হয়নি। হিন্দি পড়েছি নন্দজী এবং মনোরমাদির কাছে। ইতিহাস শিখতাম মনীষাদি, বেলাদি ও আরেক উমাদির কাছে, যিনি পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। ভূগোল জ্যোতির্ময়দা, গণপতিদা ও শুভেন্দুদা। কলেজের অধ্যাপক কিরণময়দার কাছেও ইতিহাস পড়েছি কিছুদিন। বাংলার অমিত্রসূদনদা ও অনঙ্গদাও কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এঁরা ছাড়াও বিজ্ঞানের ক্লাস নিতেন বৈদ্যনাথদা, শশধরদা, মনোরঞ্জনদা, জ্যোতিদি এবং ঝর্ণাদি। স্যোসাল স্টাডি পড়াতেন প্রসেনজিৎদা। অমিয়দা বা চিত্তপ্রিয়দা অধ্যক্ষ ছিলেন কিন্তু তাঁদের ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়নি। মনোরঞ্জনদা একবার অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আগে এক সপ্তাহ রোজ সারাদিন ক্লাস নিয়ে গত তিন বছরের পড়া প্রথম থেকে শেষ অবধি নতুন করে পড়িয়েছিলেন মনোরঞ্জনদা। কাশীনাথদার কাছে সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া নিষেধ ছিল, তিনি ব্রিজ খেলতেন সেসময়; তাই রাত্রিবেলায় কিচেন ফেরৎ তাঁর কাছে পড়তে যেতাম তিনসঙ্গী বাড়িতে। থিন অ্যারারুট বিস্কিট খাওয়াবেনই তিনি, এক ক্যানিস্টার বিস্কিট সর্বদা মজুত থাকত তাঁর ঘরে।

তাঁদের নিয়ে কী গল্প মনে পড়ে ভেবে দেখি –

উমাদি (রায়) একদিন নির্দেশ দিলেন সকলে যে যার নিজের নামে ছড়া লেখো। সবাই লিখল কিন্তু মোহাম্মদ ইসহাক তো মাথা চুলকিয়েই চলেছে, "কী করে কবিতা লেখে উমাদি বলে দিন।"

- "আরে বাবা, অন্ত্যমিল থাকলেই তো হ'ল, যেমন ধর "শ্যামল মজুমদার, শিশুবিভাগের সর্দার, বুঝলি না, র-এ র-এ কেমন মিলে গেল!"

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ইসহাক লিখে শোনাল, "মোহাম্মদ ইসহাক, করে বকবক"। হাসতে হাসতে আমাদের পেটে ব্যথা হয়ে গেল।

সুবীরদা ক্লাসে 'ব্যাখ্যা' লিখতে বলতেন। আমি তো সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবই। কী করতাম? একটা উদাহরণ দিই।

"মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম
অন্তবিহীন পথ
আসিতে তোমার দ্বারে,
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।"

আমি হয়তো এরকম কিছু একটা লিখতাম, 'সেই মরুভূমির তীর থেকে তোমার দ্বারের সুধাশ্যামলিম পারে আসতে, অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এলাম মনে হ'ল ব্যস কেল্লা ফতে। সুবীরদা উজাড় করে নম্বর ঢেলে দেবেন। বাকিরা কত কী লিখছে, উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিটি..., অন্তর্নিহিত অর্থ..., মরুতীর কথাটির নিগূঢ় অর্থ ইত্যাদি। আসলে সুবীরদা বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে একবার যা গুরুদেব লিখে ফেলেছেন তা আর অন্য কোনোভাবে লেখা সম্ভব। সরলমতি সজ্জন মানুষরা এভাবেই বদ ছাত্রদের হাতে ম্যানেজ হয়ে যান চিরকাল। ভাদুর গান লেখার সময় সুবীরদা ছাড়া কিন্তু চলত না, একেবারে অপরিহার্য ছিলেন।

মলিনাদির ক্লাসে বেশিরভাগ দিনে আমরা আত্মকথা লিখতাম। একটি গাছের আত্মকথা, পিঁপড়ে, কাঁকড়, পথ, কুঁড়েঘর, পুকুর সকলের আত্মকথা। একদিন তিনি আসেননি, মিগমেড আর ফিরোজ গাছে চড়ার উদ্যম নিচ্ছে, এমন সময় শালবীথি দিয়ে হেঁটে আসছিলেন অমিয়দা, দেখে ফেললেন। দাঁড়িয়ে গেলেন, আমরাও সম্মোহিত, স্থানুবৎ। উল্টোদিক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে, মাথায় ফুল গুঁজে আসছিলেন মিষ্টুনীদি; অমিয়দা তাঁকে থামালেন, "মিষ্টুনী, এদের বাংলা ক্লাসটা নিয়ে নাও তো।" বেচারি মিষ্টুনীদি কোন কাজে, কোথায় যাচ্ছিলেন কে জানে, চুপচাপ এসে আমাদের বাংলা ক্লাস নিতে মলিনাদির বেদীতে বসে পড়লেন। অমিয়দা তো আর জানতেন না যে মিষ্টুনীদিকে আমরা বড় দিদি হিসেবে থোড়াই মানতাম; তিনি তো আমাদের সকাল সাঁঝের বন্ধু, আমরা তাঁর কাছে গান শিখি,

ধাপসা খেলি, আরো কত কী।

নলিনীদি ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ। শুধু পড়াশুনা নয় তাঁর নজর থাকত পরিচ্ছন্নতা, সহবত, ইত্যাকার সুঅভ্যাসের প্রশিক্ষনেও।

বুবুদির ক্লাসে যারা ভাল গল্প বলতে পারত তাদের খুব খাতির। আমি প্রায়শই স্বরচিত ভূতের গল্প বলতাম, বুবুদিসহ সবাই মন দিয়ে শুনতেন। গল্পের ভেতর সারবস্তু হতো নাটকীয়তার আধিক্য; হাত নেড়ে মুখভঙ্গি করে হাঁউ মাউ খাঁউ করাটাই ছিল আকর্ষণ। আরো কেউ কেউ গল্প বলত বটে কিন্তু নাটকীয়তায় আমাকে হারাতে পারেনি। চিরকাল সস্তায় বাজিমাত করায় আমার জুড়ি মেলা ভার।

কল্যাণীদি ছিলেন এক সর্বব্যাপী মা; যেমন ভয় পেতাম, তেমনি ভালবাসতাম। ইংরেজিতে কিছু বলতে গেলেই আমার মধ্যমেধাক্রান্ত পাতি বাঙালি জিভ প্রবল অসহযোগিতা করত। সেই জড়তা কেটেছিল কেবল কল্যাণীদির অসীম ধৈর্য পরীক্ষায়। সবাইকে প্রতিদিন এক একটি প্রশ্নে পড়া ধরতেন আর সকলের শেষে আমার বরাতে ছিল 'Sum up'. আমার তোতলামি, অক্ষম পরাজিতের বোকা হাসি, কিছুতেই ছাড় মিলত না। আর কারো তেমন সাহস ছিল না হাসার মতো বাচালতার। দিনের পর দিন এই অধ্যবসায় শেষপর্যন্ত আমার জড়তা ঘুচিয়েই ছাড়ল। তিনি পড়াতেন Text, গদ্য ও কবিতা। Three Men in a Boat, Rules (এটার নাম কি The Pekinese Dog ছিল? "Rules are not whips to scourge the people with..."), The Village Doctor, Discovery of India, "mēnē mēnē tekəl yo͝ofärsin" bible-এর একটা টুকরো, এইসব মনে পড়ছে।

বিকাশদার বিষয় ছিল ইংরেজি ব্যাকরণ। পদ্ধতি বিচিত্র বা অনুমানের অতীত। প্রতিদিন বিশ্বসাহিত্য থেকে নতুন নতুন টুকরো নিয়ে বাক্যের গঠন, প্রকৃত (chaste) ইংরেজি কেন শুধুই সঠিক (correct) ইংরেজি হতে ভিন্ন, তাকে নানা কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে শেখাতেন। নিয়মিত পাঁচটি অচেনা শব্দ বানান করে লেখাতেন, স্টাডির সময় ডিকশনারি দেখে শব্দগুলির ইংরেজি অর্থ বুঝে তা দিয়ে বাক্য গঠন করে পরদিন ক্লাসে পড়ে শোনাতে হবে। ঠিক ভুল ছাড়াও যথার্থ প্রয়োগের দিশা তিনি উদাহরণসহ দর্শাতেন। তাঁর সঙ্গে তুলনীয় আমি আর কাউকে দেখিনি। ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস একটি বিষয় যে এত আকর্ষণীয় হতে পারে ভাবা যায় না। বিশ্বসাহিত্যটা তো ইতরীয় ভাষায় ফাউ।

জীবনদা পড়াতেন কবিতা ও নাটক। তাঁর কণ্ঠে "Half a league, half a league, half a league onwards..." এখনো কানে ভেসে আসে। "Home they brought her warrior dead..." কখনো কি ভুলতে পারব? The Monkey's Paw, Bishop's Candlesticks, তাঁর কাছেই পড়েছি। এসবই rapid reader-এর অংশ ছিল। অ্যান্টনিদা আর কল্যাণীদির নির্দেশনায় Bishop's Candlesticks অভিনয়টি মঞ্চস্থ হয়েছিল। অ্যান্টনিদা স্বয়ং Convict-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

চাচক্র বা দিনান্তিকা বাড়িতে কাশীনাথদা আমাদের অঙ্ক ক্লাস নিতেন। ক্লাস সেভেন/এইট হবে। একদিন আমার কলম ফেলে রেখে পরের ক্লাসে চলে গিয়েছিলাম। খেয়াল হতেই ছুট্টে ফিরে গিয়ে দেখি দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস চলছে। আমি অনুমতি চাইতেই প্রবেশের সম্মতি মিলল। যেই পা ফেলেছি কাশীনাথদা গম্ভীর স্বরে বাচ্চাদের বললেন, "তোমাদের দাদা এসেছেন, তোমরা উঠে দাঁড়ালে না?" হুড়মুড়িয়ে সবাই উঠে দাঁড়াল। আমি হকচকিয়ে কলম নিয়েই পলায়নপর হতেই আবার সেই গম্ভীর স্বর, "তোমায় দেখে ভাইবোনেরা উঠে দাঁড়াল, তুমি তাদের বসতে বললে না?" কোনোরকমে "বসো বসো" বলে পালিয়ে বাঁচলাম। সম্পূর্ণ শিক্ষামনস্কতা হয়তো একেই বলে।

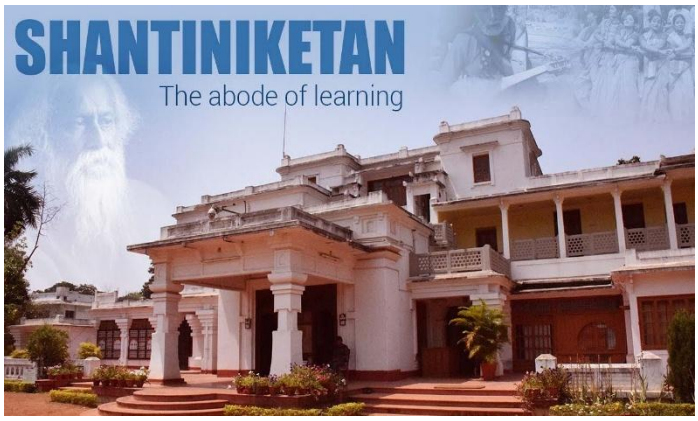

আন্দামান ভ্রমণ – পর্যটন নাকি অনুভূতি

বীরেশ্বর মিত্র

প্রথম দিন পোর্ট ব্লেয়ারে প্লেন নামল দুপুরবেলায়। নামার সঙ্গে সঙ্গে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি মনকে ছুঁয়ে গেল। অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল আন্দামানে যাবার। আজ সেই স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। এই দ্বীপটির সঙ্গে যে ভারতীয়দের একটি বিশেষ যোগ আছে! স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে ইংরেজদের পাশবিক অত্যাচার সত্ত্বেও ভারতের সন্তানরা মুখ ফিরিয়ে থাকেননি।

এয়ারপোর্টে গাড়ি ছিল, নিয়ে গেল শহরের সুন্দর এক হোটেলে। একটু বিশ্রাম নিয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে রওনা দিলাম সেলুলার জেলের দিকে, যা কালাপানি নামেও প্রসিদ্ধ। প্রধানত এই কারণেই আন্দামানে আসা। সেলুলার জেল কি শুধুই একটি স্থাপনা? আসলে এটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অতি মূল্যবান নীরব সাক্ষী। ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এর নির্মাণ কাজ চলে। ব্রিটিশরা এই জেল তৈরী করেছিল বিশেষত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য। সাতটি উইংয়ে বিভক্ত এই জেলে ৬৯৬টি একক সেল তৈরী করা হয়েছিল, যেখানে প্রতিটি বন্দীকে আলাদাভাবে রাখা হতো, যাতে তাঁরা একে অপরের মুখ না দেখতে পান বা বাক্যালাপ করতে পারেন। এখানেই নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল বহু বিপ্লবীকে যেমন, বীর সাভারকার, বটুকেশ্বর দত্ত, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকার দত্ত প্রমুখ আরো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। তাঁদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হতো, সেখানে জীবন ছিল অসহনীয়। মূল ভূখণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এই সেলুলার জেল। একবার সেখানে পাঠানো হলে তখনকার দিনে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল, সব বন্দীদেরই দন্ড ছিল আজীবন কারাবাস। এটি শুধু শারীরিক শাস্তি নয়, মানসিক বিচ্ছিন্নতার এক কঠিন রূপও বটে।

সন্ধ্যেবেলায় আবার গিয়েছিলাম 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শো দেখতে সেলুলার জেলে। এই শো ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যখন বন্দীদের আর্তনাদ, সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের কাহিনী শোনা যায় তখন রক্ত গরম হয়ে ওঠে; চোখের জল সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। ইংরেজদের প্রতি রাগে ও ঘৃণায় মন বিষিয়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতার এই মূল্য অত্যন্ত কঠিন ছিল!

দ্বিতীয় দিন ফেরি করে গেলাম হ্যাভলক দ্বীপ দেখতে, যা বর্তমানে স্বরাজ দ্বীপ নামে পরিচিত। ঘন্টা দুয়েক লাগল পৌঁছাতে। প্রথমে গেলাম রাধানগর বীচে। সাবমেরিনে করে বিভিন্ন ধরনের কোরাল আর বিচিত্র রকমের মাছ দেখতে গেলাম; মনে হ'ল অন্য এক জগতে প্রবেশ করেছি, এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা! বীচের নরম সাদা বালি, স্বচ্ছ নীল জল আর সূর্যাস্তের সময় আকাশের রঙ বদলের খেলা মনকে মুগ্ধ করে।

তৃতীয় দিন আবার ফেরি করে যাওয়া হ'ল নীল আইল্যান্ডে, যার বর্তমান নাম শহীদ দ্বীপ। ঘন্টা তিনেক লাগল। এখানে প্রকৃতি আরো নির্জন, আরো নির্মল। লক্ষণপুর বীচের সূর্যাস্ত অতুলনীয়। এছাড়া সমুদ্রের ঢেউ আর পাথরের মিলনে গড়ে ওঠা সেতুটিও এখানের এক বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। এটি

প্রকৃতির এক অসাধারণ রূপ। নীল আইল্যান্ডে কোন শহুরে আকর্ষণ নেই, সরলতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এর আসল সম্পদ। সন্ধ্যের পর ফিরে এলাম পোর্ট ব্লেয়ারে।

চতুর্থ দিনের পরবর্তী আকর্ষণ ছিল রস আইল্যান্ড, আবার সেই ফেরি। এটি এককালে ব্রিটিশদের প্রসাশনিক কেন্দ্র ছিল। এর নতুন নাম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আইল্যান্ড। কিন্তু ভূমিকম্প এবং যুদ্ধের ফলে দ্বীপটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি যেন

ধীরে ধীরে মানুষের সব অহংকার গ্রাস করে নিয়েছে | আজ সেখানে দেখা যায় ভগ্নাবশেষ | গাছের শিকড়ে ঢাকা পুরনো ভবন, হরিণ এবং ময়ূরের অবাধ বিচরণ | ইতিহাস এবং প্রকৃতির এক অদ্ভুত মেলবন্ধন এখানে অনুভব করা যায়|

পঞ্চম দিনে পোর্ট ব্লেয়ার | প্রথমে Corbyn's Cove Beach দেখা হ'ল | শহরের কাছেই একটি জনপ্রিয় সৈকত | নারকোল গাছে ঘেরা সুন্দর পরিবেশ | তারপর পোর্ট ব্লেয়ারের খুব নামকরা Anthropological Museum দেখতে গিয়ে আন্দামানের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলাম |

এদিন সন্ধ্যায় গেলাম রামকৃষ্ণ মিশনে | ভাগ্য ভাল ছিল, সন্ধ্যা-আরতি দেখতে পেয়ে খুব ভাল লাগছিল | এটি একটি অত্যন্ত শান্ত, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের কেন্দ্র, যা বিশেষভাবে আকর্ষণীও | এটি শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, এঁদের বিভিন্ন সমাজসেবার কাজেও সক্রিয় যোগদান আছে|

পোর্ট ব্লেয়ারের সাথে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের গভীর এবং ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায় | আন্দামানের প্রকৃতি বৈচিত্রে ভরপুর | ঘন অরণ্য, ম্যানগ্রোভ, কোরাল ওয়াল, বিরল প্রজাতির পাখি ও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী সব মিলিয়ে অসাধারণ | সমুদ্রের নীল জল এতটাই স্বচ্ছ যে নৌকায় বসেই নিচের কোরাল এবং মাছ দেখা যায় | আন্দামানে বিভিন্ন জাতি এবং সংস্কৃতির মানুষের বসবাস | এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও শান্ত | প্রকৃতির সাথে তাদের এক নিবিড় যোগসূত্র আছে|

নিকোবার দ্বীপে প্রবেশাধিকার কেবল অনুমোদিত দর্শনার্থীদের জন্য সীমাবদ্ধ | প্রবেশের জন্য অনুমতিপত্রের প্রয়োজন | আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষার কারণে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় বাইরের লোকজন যেতে পারে না | সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে ছবি তোলা যায় না | পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় | পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করা নিষেধ | সেখানে দর্শনার্থীদের অবশ্যই স্থানীয় রীতিনীতি ও বিধিবিধান মেনে চলতে হয়।

আন্দামান ভ্রমণ শেষে বার বার শুধু একটা কথাই মনে হয় যে এটি শুধুই পর্যটকদের গন্তব্য স্থান নয়, এটি একটি গভীর অনুভূতির জগৎ | সেলুলার জেলের ইতিহাস আমাদের বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় স্বাধীনতার জন্য বহু মনীষীর

আত্মত্যাগের কথা | হ্যাভলক আর নীল দ্বীপের শান্ত সৌন্দর্য মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে | ইতিহাসের বেদনা এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই দুয়ের মেলবন্ধন আন্দামানকে এক অনন্য ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে নির্ধারিত করেছে | এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতা চিরদিন হৃদয়ে অমলিন থাকবে |

ষষ্ঠ দিন বিদায় নেবার পালা | বিদায় নেবার সময় মনে হয়েছে – আমি কিছু ছবি আর স্মৃতি নিয়ে ফিরছি না, সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি এক গভীর অনুভূতি, শ্রদ্ধা আর পরম শান্তি |
বিদায় আন্দামান – তুমি রয়ে যাবে হৃদয়ের গভীরে |

আজকের যে ভারতে আমরা নিশ্চিন্তে বাস করছি, সেই স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে গিয়ে অকারণে নির্যাতিত হয়েছেন এবং প্রাণ বলিদান দিয়েছেন বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী | সেই অসংখ্য দুঃসাহসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম |

টুকরো কথারা

জয়তি বোস

বহু বছর আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়ে পড়তে গিয়ে কুমারদার (রায়) কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনেছিলাম – তোমার সহ-অভিনেতার কথা এমনভাবে শুনবে যেন প্রথমবার সেটা শুনছ | আর এটা চর্চা করতে হবে রিহার্সালে, প্রতিদিন, প্রতিবার; যেমন করে স্লেটটা বারে বারে মুছে ফেলতে হয় লেখার পর | তেমনই মুছে ফেলে আবার লিখতে হবে গোড়া থেকে |

কথাটা মনে ধরেছিল | কেন যে তা প্রয়োজন, সে কথা স্পষ্ট করে বলেননি | আমিও তলিয়ে বুঝে নিইনি বটে, তবে অভিনয়ের জন্য যে এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় টিপস্ – সে ভাবনাটা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল | এমনই শত রকম টুকরো কথা নানা জনে নানা সময়ে বলেছেন, আর আমিও নিজের মতো করে বুঝে নিয়েছি, বাড়িয়ে নিয়েছি সবটা | নিজের কাছে সম্পূর্ণ করে নিয়েছি এঁদের | তাই কখনো কখনো ভাগ করে নিতে ইচ্ছে হয় এই পথ চলা |...

থিয়েটার আমার কাছে একটা জার্নি, গন্তব্যে পৌঁছানো নয় | একান্ত নিজস্ব এক অভিযান, নিজের রাস্তা খোঁজা | প্রথম দিকে যখন সবে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' নাট্যদলে যোগ দিয়েছি তখন অশোকদা (মুখোপাধ্যায়) একদিন জানতে চেয়েছিলেন, "কেন থিয়েটার করতে চান জয়তি?"
সত্তর দশকের সেই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়ে apolitical শান্তিনিকেতনী, আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, "আমার অভিনয় করতে ভাল লাগে, তাই |"

পঞ্চাশ বছর বাদে এসে আজ ভাবি অভিনয় করাটা আমার ভবিতব্য ছিল, এটা না করে উপায় ছিল না আমার | এখন আবার অনায়াসে বলতে পারছি যে আর নয়, আর থিয়েটার করব না | এমন অনুভূতি কেন যে হচ্ছে, তা সঠিক বলতে পারব না; তবে এই মনে হওয়াটাকে আমি সম্পূর্ণরূপে গুরুত্ব দিচ্ছি, স্বীকৃতি দিচ্ছি | থিয়েটারই আমাকে এমনটা শিখিয়েছে | শিখিয়েছে – জীবনে বেঁচে থাকায় কেউ না হতে | বরং অন্যদের দেখো, পর্যবেক্ষণ করো, তবেই তো তুমি বিশ্বাসযোগ্যভাবে নানান চরিত্র হয়ে উঠতে পারবে |

আবার গ্রিপস্ থিয়েটার করতে গিয়ে যখন ছোটদের চরিত্রে অভিনয় করেছি, তখন অন্য আরেক পথে হাঁটতে শেখা হ'ল | সেখানে চরিত্র হয়ে ওঠা নয়, নিজেরই ছোটবেলাটাকে আবিষ্কার করতে শিখলাম | বড় হওয়ার তাগিদে আমরা সামাজিকতার বেড়াজালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলি; সেই সত্যকে চিনতে শেখা, অভিজ্ঞতার সোপান ভাঙতে ভাঙতে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া – ছোটদের চরিত্র অভিনয়ে সেটাই ছিল প্রাথমিক শিক্ষা |

আর এমন পথে চলতে গেলে শুনতে হবে, দেখতে হবে, অনুভব করতে হবে | খেয়াল রাখতে হবে কখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে শুনছি না, আর তখনই আমি উপস্থিত থাকব বর্তমানে – কে না জানে যে 'Theatre is Here and Now'!

আরো অনেক পরে শিখছি জীবনে চলার পথে মন দিয়ে নিজেকে এবং অন্যকে শুনতে হয় – সে গপ্পো আরেক সময় হবে |

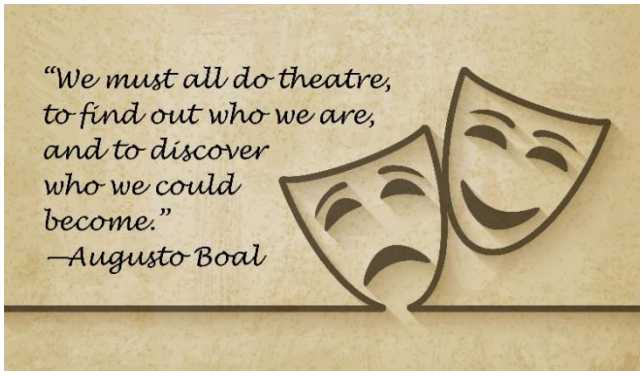

ধরিত্রী

আশীষ দত্ত রায়

প্রথম কৈশোরের এক অপরাহ্নবেলায় নিজের নামটা যখন প্রথম নিজের কানে এক অমোঘ নির্দেশের মতো আছড়ে পড়ল, ঠিক তখনই এক আশ্চর্য পাথুরে ভারে নুয়ে পড়েছিল মেয়েটা। ধরিত্রী। নামের ভেতরেই যেন লুকিয়ে ছিল অনন্তকাল আর সহস্রাব্দের প্রাচীন কোনো গুরুভার যা জমাট বেঁধে দলা পাকিয়ে তার সত্তার মধ্যে গেঁথে গেছে। স্কুলের রোল-কলের সময় দিদিমণি যখন ওই নামে ডাকতেন, তখন সহপাঠিনীদের হাসির গুঞ্জন নয় বরং এক অদ্ভুত থমকে যাওয়া নিস্তব্ধতা তাকে ঘিরে ধরত। মনে হতো এক চঞ্চল কিশোরী প্রাণের অস্থিরতার ওপর কেউ যেন জোর করে এক প্রাচীন জরাগ্রস্ত পৃথিবীর ধূসর পোশাক চাপিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি কোনোদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করত এমন নাম কেন, ধরিত্রী কেবল ম্লান হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলত যে সে কিচ্ছু জানে না, আসলে ওই নাম দাদু রেখেছেন।

দাদু তখন ছিলেন নিজের স্মৃতির শেষ সোপানে দাঁড়ানো এক ছায়াময় অস্তিত্ব। তিনি পৌরাণিক গল্পের জাল বুনতেন কিন্তু গল্পের পরিণতি কিছুতেই মনে রাখতে পারতেন না। চরিত্ররা এক যুগের গণ্ডি পেরিয়ে অন্য যুগে ঢুকে পড়ত আর সময়কাল সেখানে একাকার হয়ে এক আশ্চর্য কুয়াশা তৈরি করত। দাদুকে সেই মোক্ষম প্রশ্নটা করার সুযোগ ধরিত্রী আর কোনোদিন পায়নি যে কেন তিনি ওই স্থাণু আর পাহাড়প্রমাণ ধৈর্যশীলা পৃথিবীর নামটাই তার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

আশির দশকের শেষলগ্নে তার এই ধুলোর পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া। কাগজে কলমে সে হয়তো জেনারেশন জেডের এক প্রতিনিধি কিন্তু তার বেড়ে ওঠার ছন্দটা ছিল বড়ই মন্থর আর মায়াবী। ঠিক যেন কোনো এক নিস্তব্ধ আলস্যমাখা দুপুরের করুণ রাগিণী। কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পাড়ার সেই ঘুপচি অলিগলি যেখানে বারান্দার শাড়ির আঁচল রোদে লুটোপুটি খেত আর দুপুরে রেডিওর নস্টালজিক সুর ভেসে আসত সেখানে সে বড় হয়েছে। টিভি থাকলেও তার সরব উপস্থিতি ছিল কেবল বিশেষ বিশেষ সময়ে। বাংলা মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী ধরিত্রীর কাছে ইংরেজি ভাষাটা ছিল এক প্রয়োজনীয় বর্ম মাত্র কিন্তু তার রক্তমাংসের টান ছিল সেই প্রিয় বাংলা ভাষার নিবিড় সখ্যের সঙ্গেই। সে ছিল এক আশ্চর্য বৈপরীত্যের সমাহার। কখনো সে খিলখিলিয়ে হাসত আর অনর্গল কথা বলত কিন্তু পরক্ষণেই এক অতলান্ত মৌনে ডুবে যেত। এই নিস্তব্ধতা বাইরের কেউ লক্ষ্য করত না কারণ সবাই ভাবত মেয়েটা তো জন্ম থেকেই এমনই উচ্ছল স্বভাবের। কিন্তু সেই উচ্ছলতার গর্ভেই যে এক অন্য পৃথিবীর নিঃশব্দ জন্ম হচ্ছিল তা কে জানত!

কলেজে বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়তে যাওয়াটা ছিল তার জীবনের এক স্বাভাবিক ললাটলিখন। যারা তার ভবিষ্যৎ আর জীবিকা নিয়ে সংশয়ের প্রশ্ন তুলেছিল ধরিত্রী তাদের কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেনি কারণ শব্দরাই তখন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলত আর তাকে মমতায় জড়িয়ে ধরত। শব্দের সেই মায়াবী অরণ্যে সে খুঁজে পেত এক গভীর অলৌকিক আশ্রয়। পড়াশোনা শেষ হতে না হতেই এল সেই চিরন্তন সামাজিক বাধ্যবাধকতা যার সহজ নাম হ'ল বিয়ে। পাত্র কর্পোরেট জগতের এক ঝকঝকে মানুষ, অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিম চটুলতা ছিল না। সে ছিল এক শান্ত গম্ভীর মহাসাগর, যে কথা বলার আগে প্রতিটি শব্দকে নিপুণভাবে মেপে নিত।

ধরিত্রী প্রথমে ভেবেছিল এই ধীরতা বোধহয় মনের দূরত্ব তৈরি করবে কিন্তু পরে সে গভীরতরভাবে বুঝল এটাই আসলে মানুষটার অস্তিত্বের সহজ সারল্য। বিয়ের পর সেই একান্নবর্তী পরিবারের গোলকধাঁধায় পা রাখা। প্রথম কয়েকটা মাস যেন এক ঘোরের মধ্যে কেটে গেল। নতুন নিয়ম আর নতুন মুখগুলোর ভিড়ে নানা ব্যস্ততায় রান্নাঘরের সেই বিরামহীন প্রস্তুতি তাকে মানতে শেখালো অনেক কিছু । তার সহজাত চঞ্চলতা আর কথা বলার প্রবৃত্তি শুরুতে বাড়ির সবাইকে মুগ্ধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু সমস্যাটা শুরু হ'ল তখন, যখন সন্ধ্যে নামত। সেই কোলাহলপূর্ণ ভিড় ঠেলে সে যখন নিজের ঘরে ফিরত তখন এক বিষণ্ন শূন্যতা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রাস করত। স্বামী অফিস থেকে ফিরেও নিজের কাজের ল্যাপটপ আর ফাইলের মধ্যেই নিমগ্ন থাকত আর ঘরজুড়ে এক ভারী নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। ধরিত্রী তখন অকারণেই অনর্গল কথা বলত। নতুন কোনো সিনেমা থেকে শুরু করে শাড়ির নকশা কিংবা রঙের বাহার অথবা বাজারের চড়া দর কিংবা পাড়ার যত খুচরো সমস্যা

আর পরিবারের সদস্যদের হাজারো অভিযোগের ফিরিস্তি সে দিয়ে যেত কেবল শব্দের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করবে বলে। স্বামী সেইসব কথা মন দিয়ে শুনত আর মাঝে মাঝে স্মিত হাসত কিন্তু কোনো পাল্টা প্রশ্ন করত না। এই প্রশ্নের অভাবটাই ধরিত্রীকে এক বিশাল জনমানবহীন মরুভূমিতে একা দাঁড় করিয়ে দিত। সে মর্মে মর্মে বুঝত তার কথা কেউ থামিয়ে দিচ্ছে না ঠিকই কিন্তু কেউ পরম মমতায় সেই কথাগুলোকে আগলে ধরে নিজের বুকে তুলেও নিচ্ছে না।

একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও যে মানুষ কীভাবে একাকীত্বের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছাতে পারে ধরিত্রী তা তিলতিল করে প্রতি রাতে শিখতে লাগল। সে দূর থেকে দেখত সম্পর্কের বিচিত্র সব জটিল রসায়ন। কে কাকে বিঁধল আর কে কার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল কিংবা কোথায় তিলে তিলে নীরবতা জমে পাহাড় হয়ে উঠল সেসব তার নখদর্পণে আসত। এই নিরন্তর পর্যবেক্ষণ তাকে মানসিকভাবে ক্লান্ত করে তুলত। মাঝে মাঝে এক তীব্র বিতৃষ্ণা আসত এই ছকে বাঁধা জীবনের প্রতি। আবার যখন হঠাৎ কোনো পারিবারিক বিপদে সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত তখন তার ক্ষণিকের জন্য মনে হতো এই তো প্রাণ আর এই তো পরিবার। কিন্তু কিছুদিনেই আবার ফিরে আসত সেই চেনা হিমশীতল নীরবতা।

বছর গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে সন্তান প্রসঙ্গ উঠল। প্রথমে তা ছিল মৃদু গুঞ্জন কিন্তু পরে তা রীতিমতো এক সামাজিক দাবিতে পরিণত হ'ল। আত্মীয়দের চোখে কখনো অকারণ করুণা আবার কখনো সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ছটা ফুটে উঠত। ধরিত্রী কেবল ম্লান হাসত। স্বামী শান্তস্বরে বলত যে সময় হলেই সব হবে। কিন্তু সেই সময় যেন এক অচেনা নদীর মতো নিজের নিভৃত বাঁক বুঝে নিজের খেয়ালেই বইছিল। ধরিত্রী নিজেকে কখনো মা হিসেবে ভাবতেই পারেনি কারণ যে মেয়ে নিজের জীবনের জটিল অলিগলিগুলোই ঠিকমতো চিনে উঠতে পারেনি সে অন্য এক নিষ্পাপ প্রাণের দায়ভার বহন করবে কীভাবে সেই প্রশ্ন তাকে কুরে কুরে খেত।

একদিন সেই শান্ত মানুষটি অর্থাৎ তার স্বামী এক পাহাড়প্রমাণ নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ বলল যে দত্তক নেওয়ার কথা কি একবার ভাবা যায়? কোনো উচ্চকিত নাটক নেই সেখানে, আর নেই কোনো আবেগের আতিশয্য। ধরিত্রী প্রথমে শুনে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর বহু কষ্টে অস্ফুট স্বরে বলল, "ঠিক আছে, ভেবে দেখা যাক।" সেই ভেবে দেখাটাই হয়ে উঠল তার জীবনের কঠিনতম এক অগ্নিপরীক্ষা। সরকারি লাল ফিতে আর অন্তহীন কাগজপত্রের সেই পাহাড় কিংবা আয়ের হিসেব আর বয়সের মানদণ্ড নিয়ে তারা লড়তে শুরু করল। সবকিছু যেন এক একটা লোহার খাঁচা। সে তো ছিল কেবল শব্দের জগতের এক স্বাধীন মানুষ তাই হিসেব-নিকেশের এই নিগূঢ় গোলকধাঁধায় সে বারবার হাঁপিয়ে উঠত। এইসব নিয়ে খুঁজতে গিয়ে ইন্টারনেটের তথ্যের অতল সমুদ্রে সে আরও বেশি বিভ্রান্ত হতে শুরু করল। কীভাবে ভাল মা হতে হয় সেইসব সার্চ করতে করতে তার মনে হতে লাগল সে তো আসলে এক চরম অযোগ্য।

এই বিষয়ে ছিল না কোনো তথ্য। তাই যত সে পড়ছিল তত তার মনের ভেতর ভয় জাঁকিয়ে বসছিল। দত্তক নেওয়ার প্রক্রিয়ার মাঝপথে বহুবার তার মনে হয়েছিল সব ছেড়ে দিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যায়। কখনো তার মনে হতো সে তো সাধারণ এক মানবী মাত্র তবে সে অন্য কোনো শিশুর পরম ভাগ্য বিচার করার কে! স্বামী তখন এক অমোঘ ধ্রুবতারার মতো পাশে দাঁড়িয়ে বলত, "যদি না পারো তবে আমরা এখানেই থামব।" এই থামা শব্দটাকেই ধরিত্রী সবচেয়ে বেশি ভয় পেত। তারা মনে মনে ঠিক করেছিল একদম ছোট শিশুকেই ঘরে আনবে, যাতে সে এই পরিবারের আদিগন্ত মায়ার মধ্যেই নিজের মতো করে বড় হতে পারে, আর কোনোদিন যেন তার মনে না আসে যে সে আসলে বাইরে থেকে আসা কোনো আগন্তুক।

অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এল। পৃথা যখন এল তার বয়স ছিল মাত্র তিন মাস। একমুঠো নরম গোলাপী মাংসপিণ্ড, যার গায়ে লেগে ছিল দুধের সেই আদিম ঘ্রাণ আর চোখদুটো ছিল অসম্ভব উজ্জ্বল। ধরিত্রী যখন প্রথম ওকে নিজের কোলে তুলে নিল তখন এক তীব্র অজানা আতঙ্কে তার হাত কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল এই ছোট্ট শরীরটা বুঝি কাঁচের চেয়েও বেশি ভঙ্গুর আর একটুখানি অযত্নেই বুঝি তা চিরতরে চুরমার হয়ে যাবে। সেই প্রথম রাতেই ধরিত্রী জীবনের সবথেকে বড় এবং কঠিন সত্যিটা উপলব্ধি করল যে সে আসলে এই নতুন দায়িত্বের ব্যাপারে কিচ্ছু জানে না।

কখন শিশুটা খিদেয় কাঁদছে আর কখন নিছক মায়ের

সাহচর্যের আশায় ডুকরে উঠছে তা ইন্টারনেটের কোনো ব্লগ বা বই তাকে শেখাতে পারল না | প্রতিটি মুহূর্ত এক গভীর অপরাধবোধে সে দগ্ধ হতে লাগল এই ভেবে যে সে পৃথার প্রতি কোনো অবিচার করছে না তো| রাতে যখন সারা শহর ক্লান্তিতে ঘুমাত তখন ধরিত্রী জেগে বসে থাকত পৃথার নিঃশ্বাসের শব্দ গুনবে বলে| মাঝে মাঝে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে আলতো করে ছুঁয়ে দেখত ছোট্ট বুকটা নিয়মিত ওঠানামা করছে কি না| আর ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণেই তার নিজের নামটা এক নতুন অলৌকিক অর্থে তার চেতনায় ধরা দিল|

ধরিত্রী মানে তো পৃথিবী| পৃথিবী কি কোনোদিন কারো কাছে শিখেছিল কীভাবে সহস্র ভার ধারণ করতে হয় কিংবা সে কি শুধু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সবটুকু সহন করে যায় কোনো প্রশ্ন ছাড়াই | পৃথিবী কি আদৌ জানে তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের ভার বা সমুদ্রের অতল গভীরতা ঠিক কতটা| সে তো কেবল আপন মনে বয়ে চলে আর সবকিছুকে নির্বিকারে বহন করে চলে | ধরিত্রী পরম মমতায় বুঝল মাতৃত্ব কোনো অর্জিত শিক্ষা বা সিলেবাস নয় বরং মাতৃত্ব হ'ল এক নিরন্তর বয়ে চলা প্রাণের স্রোত|

ধরিত্রী মাঝে মাঝে ভুল করত আর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেজাজ হারাত | কিন্তু আবার গভীর অনুতাপে সেই ছোট্ট দেহটাকে নিজের বুকে আঁকড়ে ধরে অঝোরে কাঁদত | স্বামী তখন নিঃশব্দে ছায়ার মতো পাশে এসে দাঁড়াত | সেই পাশে থাকাটাই ছিল তার জীবনের সবথেকে বড় সান্ত্বনা | তারা দুজনে মিলে বুঝতে পেরেছিল যে আনন্দ কোনো বড় উৎসবে বা কোলাহলে নেই বরং আনন্দ লুকিয়ে আছে ভোরের সেই প্রথম আলোয় যখন পৃথা তার কচি নরম আঙুল দিয়ে ধরিত্রীর আঙুলটা শক্ত করে ধরে| সেই স্পর্শে কোনো জন্মগত রক্তের টান নেই ঠিকই কিন্তু আছে এক মহাজাগতিক আত্মিক সংযোগ যা কোনো লৌকিক সম্পর্কের তোয়াক্কা করে না|

ধরিত্রী আজও জানে না সে কোনোদিন ভাল মা হতে পারবে কিনা| সেই চেনা সামাজিক সংজ্ঞায় সে নিজেকে আর মেলাতে চায় না| সে শুধু এটা জানে যে সে প্রতিদিন নিজেকে তিলতিল করে ভেঙে নতুন করে গড়ছে| কোনো নিয়ম মেনে নয় বরং নিজের হৃদয়ের স্পন্দন শুনেই সে এগোচ্ছে | রাতে যখন জানালার ধারে ক্লান্ত শরীরে দাঁড়ায় তখন দেখে দূরে ওই শহরের আলোর মিছিল | পৃথিবী যেমন অজানার দিকে এক অসীম লক্ষ্যে ছুটে চলেছে কোনো ক্লান্তি ছাড়াই, তেমনি ধরিত্রীও পরম আবেগে পৃথার কপালে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেয়|

ধরিত্রী এখন গভীরভাবে বুঝতে পারে যে জীবন আসলে কোনো স্থির পূর্ণছেদ নয় বরং এক অনন্ত পথ চলা, যার কোনো শেষ নেই| কাল ভোরে পৃথা আবার নতুন কোনো বায়না বা আবদার নিয়ে জাগবে আর ধরিত্রী আবার নতুন কোনো সংশয় বা ভয় নিয়ে দিন শুরু করবে | মাটির নিচে যেমন সৃষ্টির সুর লুকানো থাকে কেবল সঠিক বসন্তের আর ফুলের অপেক্ষায় তেমনি এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোর অন্তরালেই বেঁচে থাকে আগামীর এক দীর্ঘ, দীর্ঘতর মহাকাব্য যা কেবল অনুভবের| সে শান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে আর তার অন্তরের গহীন কোণে যেন এক আশ্চর্য সুর বেজে ওঠে, যার প্রতিধ্বনি তার নিজেরই নাম, অর্থাৎ ধরিত্রী | সে তো কেবল মা নয় বরং সে হ'ল এক বিশাল ধারণকারী সত্তা|

রাত ক্রমশ বাড়ে | ঘুমন্ত পৃথার সেই শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ধরিত্রীর নিজের হৃৎস্পন্দন| অন্ধকার নিঝুম ঘরে এক আশ্চর্য মায়াবী অলৌকিক আলো খেলে যায়, যা কেবল হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব| এই তো আসল জীবন আর এই তো সেই অনন্ত শব্দহীন পথ চলা, যেখানে প্রতিটা সমাপ্তি আসলে কেবল এক নতুন মহাজাগতিক শুরুর মুখবন্ধ মাত্র|
ধরিত্রী মা হচ্ছে|

মুক্তি

নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

রূপেগুণে অদিতি অতুলনীয়া | ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে বাবা আর দ্বিতীয় বিয়ে করেননি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে | ভেবেছেন সৎমা যদি অত্যাচার করে; মায়ের অভাব অদিতিকে স্পর্শ করতে পারেনি – বাবার ভালবাসা আর যত্নের জন্য |

এক সময় এক আত্মীয় বিয়ের সম্বন্ধ আনল অদিতির জন্য | ছেলের বড় ব্যবসা, বাবা-মা মারা গেছেন, ছেলে একাই থাকে কলকাতায় | অদিতির বাবা ভাবলেন কলকাতা হলে তো খুব ভাল হয়, কারণ এই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই তো তিনি বেঁচে আছেন |

বিয়ে হ'ল | অদিতির স্বামী, অর্থাৎ নির্মল ভীষণ ভালবাসে অদিতিকে, চোখে হারায় | কিন্তু একটাই সমস্যা ধরা পড়ল সপ্তাহখানেক যেতেই – ভীষণ সন্দেহবাতিক |

হয়তো অদিতি ফোনে কথা বলছে – ব্যস, শুরু হয়ে গেল অশান্তি – "কেন কথা? কী কথা? কার সাথে কথা?"

ডেলিভারি বয় একদিন এসে কলিংবেল টিপেছে, অদিতি সই করে পার্সেল নিচ্ছে – ব্যস, "এত দেরি কেন? গল্প হচ্ছিল নাকি?"

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা ভীষণ মিশুকে | অদিতির সাথে আলাপ করতে এসেছেন | নির্মল পাশের ঘরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "আমার শরীর খারাপ বলে চলে যেতে বলো ওদের |" অদিতি বাধ্য হয়ে তাই করল |

অদিতির জন্মদিনে অনেক সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছে নির্মল | হীরের আংটি গিফ্ট করল | অদিতি জিজ্ঞেস করেছে, "আর কেউ আসবে না?" নির্মল তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, "কেন? কাউকে মিস করছ? কাকে ডাকলে খুশি হতে?" বলেই এক চড় | তারপর সব সাজানো তছনছ করে, বেলুন ফাটিয়ে, কেক ফেলে, খাবার ফেলে দিয়ে এল | অদিতি তো ভয়ে কাঁপছে |

এইসময় হঠাৎই কলিংবেল, অদিতির বাবা মেয়ের জন্য কেক আর উপহার নিয়ে এসেছেন | দরজা খুলে শ্বশুরকে দেখেই রেগে বলে উঠল, "কী ব্যাপার? কী চাই?" এমন অদ্ভুত ব্যবহারে অদিতির বাবা হকচকিয়ে গিয়ে নিজেকে সামলে বলেন, "মেয়েটার আজ জন্মদিন, একটা কেক কিনেছি, তাই দিতে এলাম |" নির্মল বলল, "ঠিক আছে, যা এনেছেন দিন, এখন ভেতরে আসতে হবে না | আজ আমরা এঞ্জয় করব |" বলেই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয় | অদিতির বাবা চোখের জল মুছতে মুছতে চলে যান |

অশান্তি, মারধোর নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় অদিতির জীবনে | বাবা যাতে কষ্ট না পায় তাই বাবাকে কিছু কিছু ঘটনা বলে, কিন্তু সবটা নয় | নির্মল যখন বাইরে বের হতো তখন বাইরে থেকে লক করে যেত, যাতে অদিতি বাইরে বেরোতে না পারে | অদিতির বাবা বলেন, "তুই চলে আয় মা, আমাদের অভাব তো কিছু নেই |"

এইভাবে একটা বছর কেটে গেল | বিবাহ বার্ষিকীর দিন নির্মল বলল, "আজ ঘুরতে যাব, রেডি থেকো |"

অদিতির মনটা ভাল হয়ে গেল | এই একটা বছর যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ভাবছিল মুক্তি কি নেই এ জীবনে?

অদিতি বলল, "একবার বাবার কাছে যাব আজ?"

আজ নির্মল বারণ করল না, বলল – "ঠিক আছে, আমি গাড়ি করে নিয়ে যাব, পনেরো মিনিটের জন্য যাবে |"

পনেরো মিনিট – কুড়ি মিনিট – পঁচিশ মিনিট হয়ে যেতেই নির্মল রাগে কাঁপতে লাগল, "এত বড় আস্পর্ধা? পনেরো মিনিট থেকে পঁচিশ মিনিট হয়ে গেল, ফেরার নাম নেই? আজই বাবার সাথে দেখা করার শেষ দিন |"

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নির্মল গেল অদিতির বাবার বাড়ি | ওর বাবা তো নির্মলকে দেখে অবাক, "কী বাবা, অদিতি মা আসেনি?" নির্মল হতবাক – "মানে? অদিতি তো আপনার সাথে দেখা করতে আসবে বলল! আমি মোড়ের মাথায় গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করছিলাম |"

- "সেকী বাবা, মেয়েটা কোথায় গেল?" বলে অদিতির বাবা কাঁদতে লাগলেন |

নির্মল রাগে পাগলের মতন করতে লাগল – এত সাহস বেড়েছে; মিথ্যে বলা? কোথায় যাওয়া হ'ল? কার সাথে গেল?

অদিতির বাবার কান্নার আওয়াজে পাড়াপড়শি ছুটে এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন | নির্মল ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে থানায় গেল, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি মিসিং ডায়েরি করা যায় না, তাই বাড়ি

ফিরে এসে অদিতির আলমারি, ড্রয়ার ঘাঁটতে লাগল, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়, কিন্তু না | সব ব্যর্থ! ভাবতে লাগল – একটা জলজ্যান্ত মানুষ কি কর্পূরের মতন উবে গেল?

এইভাবে দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছর – তিন-তিনটে বছর কেটে গেল | অদিতির কোনও খোঁজ নির্মল পেল না | ইতিমধ্যে অদিতি এখন বিদেশে, নতুন জীবন শুরু করেছে, এক সন্তানের মা, স্বামী চোখে হারায় – প্রচন্ড ভালবাসে |

যেদিন বাপের বাড়ি যাবার নাম করে বেরিয়েছিল অদিতি, সেদিনই ঠিক করে নিয়েছিল, এটাই শেষ আশা, আজ পালাতে না পারলে আর এমন সুযোগ আসবে না হয়তো এ জন্মে; আর তার মুক্তিও হবে না | তাই বাবার সাথে কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছিল | ওর বাবা সবটাই জানতেন, আর মেয়ের জীবনের জন্য এই অভিনয় বাজি রেখেছিলেন | প্রথমে দিল্লিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যায় অদিতি; সেখানেই আলাপ হয় বর্তমান স্বামী অর্জুনের সাথে | অর্জুন বিদেশে থাকে তাই অদিতিকে নিয়ে বিদেশে চলে যায় | ওখানেই ওরা বিয়ে করে বসবাস করছে | আর নির্মলের ঠাঁই হয়েছে মানসিক হাসপাতালে কারণ তার অত্যাধিক রাগ, রাস্তাঘাটে যখন তখন কারণে অকারণে লোকজনকে মারধোর করে – পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাকে | তারপর মানসিক ডাক্তারের পরামর্শে মানসিক হাসপাতালে নির্মলকে ভর্তি করা হয়েছে | অদিতির ওপর তার অনাবশ্যক অধিকারবোধ তাকে জীবনের এই পরিণতিতে উপস্থিত করল!

অল্প গল্প আর একটা কবিতা

সফিক আহমেদ

যাদবপুর ইউনিভার্সিটির মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজমের ছাত্রী সুরঙ্গনা চিরকালই একটু বোহেমিয়ান জীবন পছন্দ করে, নিয়ম কানুনের ধার ধারে না সে |
কী করে এই সুরঙ্গনা এঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, গোবেচারা সিঁথিকাটা চুলওয়ালা আনস্মার্ট শুভজিতের প্রেমে পড়েছিল, সেটা একটা গবেষণার বিষয় | এই অসম প্রেম যে পরিণয়ের পরিণতি পাবে সেটাও কোনো দূরদর্শী দার্শনিকের ভবিষৎ বাণী ছিল না | সুরো আর শুভর প্রেমটা ছিল অসম আকর্ষণের একটা ক্লাসিক উদাহরণ |

ইন্টারকলেজ ফেস্টিভ্যাল, IIT স্প্রিং ফেস্ট, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতি, Saint Xaviers কলেজের Xavotsav, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ক্যালাইডোস্কোপ, মেডিকেল কলেজের Aesculapian, সব জায়গায় JU রক ব্যান্ডের লিড ফিমেল সিঙ্গার হিসাবে স্টেজ কাঁপাত সুরো | Psychedelic লাইট আর কৃত্রিম ধোঁয়াওঠা স্টেজে সুরোর হাস্কি ভয়েস, ঝকঝকে স্বল্প বসন, নীলের গিটার স্ট্রামিং, অর্কর ড্রামিং আর হায়দারের সাক্সোফোনের সিম্ফনি যখন মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করত, তখন শুভ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার ক্যামেরাতে একের পর এক ছবি তুলে যেত সুরোর | ফটোগ্রাফি ছিল শুভর নেশা আর সুরোর ছবি তোলা হয়ে উঠেছিল তার অবসেশন | ইন্টারকলেজ ফেস্ট-এ ফটোগ্রাফিতে শুভর প্রাইজ ছিল বাঁধা, আর ফেস্ট-এর শেষে একই মঞ্চে প্রাইজ আর পার্টিসিপেশন সার্টিফিকেট নিতে উঠত শুভ আর সুরোর রক ব্যান্ড | পাশাপাশি দাঁড়াত উদ্দাম উচ্ছল পাশ্চাত্যের প্রতিভূ সুরো আর লাজুক অন্তর্মুখী সাধারণ ছেলে শুভ |

সুরো তার বন্ধুদের কাছে পরে শেয়ার করেছিল যে তার এই বোকা বোকা ছেলেটার সাথে প্রেমের পরিণতির একটা বিশেষ কারণ সেই কবিতা | শুভকে ব্যতিব্যস্ত করার জন্য একের পর এক অবাস্তব নানান বায়না করছিল সুরো | তার উত্তরে শুভ তাকে একেবারে ঘায়েল করে দেয়, আর কিছু বলার থাকে না সুরোর |

কবিতাটি ছিল এইরকম –

চাওয়ার মতো চাওয়া

আমায় একটা আকাশ দেবে,
দিতেই পারি,
সঙ্গে দেব পোয়াতি মেঘ
ঝরবে তারা অঝোর ধারায়
ভরিয়ে দেবে সব ক্ষত তোর
ধুইয়ে দেবে সব অভিমান
খুলে রাখ তোর মনের দুয়ার
জায়গা বানা, জায়গা বানা।

তবে একটা পাহাড়ই দাও
দিতেই পারি,
পাহাড়টা তো শান্ত দেখায়
বুকে যে তার অনেক আগুন
অনেক দিনের দুঃখ জমা।
ফাটবে যখন পাহাড় চূড়া,
ছড়িয়ে দেবে গরম লাভা,
সামলাবি তো, সেই অভিমান,
তৈরী থাকিস, জায়গা রাখিস।

বেশ তবে দাও আস্ত নদী
দিতেই পারি,
খরস্রোতা নদী যখন
ঝাঁপ দেবে তোর শুকনো বুকে
বাধা পেলে ঘূর্ণি তুলে
টেনে নেবে গভীর জলে
কালো গভীর অন্ধকারে
খুঁজবি জীবন, যুঝবি মরণ
তৈরী থাকিস, বাঁচিয়ে রাখিস
বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাকে।

আচ্ছা তবে দাও একটা
সবুজ দ্বীপ নীল সাগরে,
দিতেই পারি,
সাগরের ওই নোনাজলে
কান্না অনেক আছে মিশে
সবুজ দ্বীপে আছাড় খেয়ে
ছড়িয়ে পড়ে বালির পাড়ে
থাকতে হবে এক্কেবারে
একাই নিয়ে নির্জনতা
পড়বে মনে মেঠো সুর আর
নক্সিকাঁথার জীবনরেখা
তৈরী থাকিস ভেবে রাখিস।

চাস যদি তো আমাকে চা
আকাশ হয়ে থাকব ঘিরে
প্রতিরোধের পাহাড় হয়ে
সব বিপদে আড়াল হয়ে
ইচ্ছানদীর ঢেউ হয়ে রোজ
ভাসাব তোর একুল ওকুল
নীল সাগরে সবুজ দ্বীপে
নির্জনতায় প্রেমে আকুল।

চেয়েই তো দেখ,
চেয়েই তো দেখ!

শিল্পী: সফিক আহমেদ

পুরানো সেই

সুজয় দত্ত

এ জীবনতরী শ্লথ হয়ে আসে, পঞ্চেন্দ্রিয় হয়ে আসে ক্ষীণ,
তবু শুনি যেন কার পিছুডাক, থেকে যেতে বলে আরও কিছুদিন।
না বলা কথারা ভীড় করে আসে, স্মৃতির মেঘেরা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
আলোআঁধারির খেলা চলে বুকে, লুকোনো বেদনা বৃষ্টি ঝরায়।
যারা এসেছিল, যারা চলে গেছে, রেখে গেছে কিছু ধূসর চিহ্ন,
হৃদয়ের টানে বাঁধা পড়ে সেই বাঁধন করেছে হেলায় ছিন্ন,
আজও আছে তারা মনের গহীনে ছায়া ছায়া কিছু অনুভূতি হয়ে,
চুপিচুপি এসে ডাক দিয়ে যায়, নীরবেই যায় কত কথা কয়ে।
সেই যে কে এক ছিল বাঁশিওয়ালা, প্রতিদিন যেত কী সুর শুনিয়ে
গোধূলিবেলায় মোহনবাঁশিতে কল্পনাজাল প্রাণেতে বুনিয়ে।
তার পিছুপিছু আরও একজন – ঝুমঝুমি আর রঙিন খেলনা
পিঠের ঝুলিতে ভরা ছোটদের স্বপ্নের ধন, নয় সে ফেলনা।
ফিরবে না তারা, মন জানে তবু কেন যে তাদের পিছু পিছু ধায়?
ছোট ছোট পাওয়া, ছোট ছোট খুশী – তার পানে আজও দুহাত বাড়ায়।
পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসবে যার লাটাইয়ের টানে
কাটা যেত আর সকলের ঘুড়ি সে আজ কোথায়? কেউ কি তা জানে?
কিংবা ছাদেতে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার সময় ধারালো
কাঁচে কাটা হাতে রক্ত মুছিয়ে দিত যে মেয়েটি, সেও তো হারালো
সময়স্রোতের ঘূর্ণিতে। ঠিক যেমনটি গেছে আগিন মাহাতো –
পাড়ার গোয়ালা, দুধ দিত রোজ, শীতে খড় জ্বেলে আগুন পোহাতো।

তার দোস্ত সেই বনোয়ারীলাল – ঝাঁটা হাতে আর বালতির জলে
বাড়ি বাড়ি রোজ ময়লা সাফাই, তারপর স্নান রাস্তার কলে।
বৌ ছিল তার ঘুঁটেওয়ালি আর ছেলেটা বেচত কয়লার গুঁড়ো,
পুরনো কাগজ কিলোদরে কিনে ঠোঙা হতে দিত তারই এক খুড়ো।
ওদের খুপরি, আমাদের ফ্ল্যাট দূরত্ব যেন লক্ষ যোজন।
তবু ছিল ওরা বন্ধুর মতো বিপদে আপদে আপনার জন।
মন্টেসরির শেফালী আন্টি, প্রাইমারী স্কুলে বীথি দিদিমণি
গানের টিচার – স্বরলিপি ছাড়া গান শেখাতেন সোম আর শনি।
টিফিন বেলায় ফুটপাথে কেনা কুলের আচার, নুন দেওয়া শশা,
সকাল বিকেল স্কুলের গেটেতে মোটা লাঠি হাতে পাহারায় বসা
রামরূপ সিং, শিবধনী লোধ – মুখ মনে নেই, ধোঁয়া-ধোঁয়া সবই –
বুকের বিজন ছবিঘরে যেন সারি দিয়ে রাখা ধুলোজমা ছবি।

বিকেলে মাঠেতে চাঁদা করে কেনা রবারের বল নিয়ে হুটোপুটি,
সন্ধ্যেবেলায় মাটির উনুনে গরম তাওয়ায় ফুলো ফুলো রুটি,
মন্দিরে শাঁখ, আরতির ধ্বনি, আজানের ডাক, পড়ুয়ার গলা –
সব পিছু ফেলে জীবনের এই গোধূলি বেলায় একা একা চলা
সেই ধ্রুব পথে – শেষ হয় যার কবরে কিংবা শ্মশানের ঘাটে।
এই পৃথিবীকে ভালবেসে যেন জীবনের বাকি দিনগুলো কাটে।

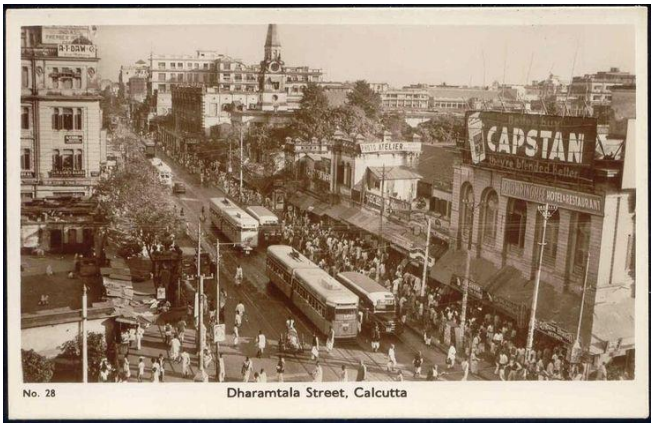

পৃথিবী

কমলপ্রিয়া রায়

এই পৃথিবী বড়ই সুন্দর
ফুলের সুবাসে ভরে অম্বর
ঘুম ভাঙে পাখির ডাকে
শ্যামলিমা নদীর বাঁকে
পায়ে পায়ে হেঁটে চলি
নরম আলোয় সকলে মিলি।

আবার যখন বৃষ্টি আসে
মুক্তকণা ঘাসে ঘাসে
পৃথিবী যেন সবুজ শাড়ি
বিজুলি তার অলংকারী
বড় সুন্দর বড় গভীর
মন উড়ে যায় ছাড়িয়ে নীড়।

যখন ধূসর ঘোমটা ঘিরে
সন্ধ্যা নামে নদীর তীরে
সব কলরব বন্ধ করে
পাখিরা ওই ঘরে ফেরে
ধীরে ধীরে রাত্রি আসে
পৃথিবী যেন কাঁপে তরাসে
তখন হে রাজাধিরাজ,
তুমি তাকে আপন করো
ঘুমের চাদর বিছিয়ে দিয়ে
তুমিই তাকে শান্ত করো।

মনসঙ্গীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

কীসের এত দম্ভ রে তোর, কীসের অহংকার,
কে দিল এই শিক্ষা তোকে, কে বোঝালো সার!

ইঙ্গিতে যার বসলি পদে, সে রাখে সব হিসেব,
যেদিন তোরে ফেলবে ভুঁয়ে, রাখবে পায়ের নীচে,
সেদিন তোকে কে বাঁচাবে, কে নেবে তোর ভার?
কে দিল এই শিক্ষা তোকে, কে বোঝালো সার!

শুনিস না তুই কারো কথা, নিসনে আদেশ কানে,
যেদিন তোর এই ভাঙবে নেশা, চাইবি রে কোন পানে?

সেদিন দেখিস শাস্তি কী হয়, এমন পাপের ফল,
রইবে না কেউ সেদিন পাশে, কেউ দেবে না জল!
সত্যের জয় হবেই সেদিন, এই অনন্ত যার!
কে দিল এই শিক্ষা তোকে, কে বোঝালো সার!

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

আনন্দে তুই থাকিস মজে, আনন্দের এই ভুবন,
যার ভবনে আনন্দ গান, আনে সুরের প্লাবন!

সাধ্যি রে কার দুখ তোরে দেয়, আনন্দ যার সঙ্গে,
সাধ করে কে হানবে আঘাত, যার রসরাজ অঙ্গে?
নিত্য মনে আনন্দ ঢেউ, খুশির তালে মগন,
তার ভবনে আনন্দ গান, আনে সুরের প্লাবন!

জোর করে যে ব্যথা আনে, সেই – ব্যথা যাবে ফিরে,
আনন্দ তোর রইবে আপন, সদাই মনের দোরে!

ছড়িয়ে বেড়াস তৃপ্ত হাসি, আনন্দের এই আশিস,
বিলিয়ে দিয়ে প্রেমের প্রসাদ, সর্বে ভালবাসিস,
যার ছোঁয়াতে আনন্দ তোর, নিত্য ভরে আঙ্গন,
তার ভবনে আনন্দ গান, আনে সুরের প্লাবন!

আমার রবীন্দ্রনাথ

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনের আনাচে, কানাচে,
আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে, চিন্তায়-মননে|
তিনি আমার নিদ্রায়-জাগরণে, স্বপ্নে-বাস্তবে,
কর্মে-আলস্যে, যুক্তি-তর্কে, সুখ-দুঃখে,
আনন্দ-বিষাদে, মিলন ও বিরহে, প্রেম-বিবাদে,
যুদ্ধে-শান্তিতে, প্রাচুর্য্যে-দারিদ্রে, সহমতে-প্রতিবাদে,
নিন্দায়-প্রশংসায়, নিঃশব্দতায়, কোলাহলে,
আরাধনায়, প্রার্থনাতে, বচসায়, আড্ডায়,
ক্ষুধায়, বেদনায়, মুক্তি ও বন্ধনে!

রবীন্দ্রনাথ আমার চেতনার অভিব্যক্তিতে,
আমার ক্রোধ সংবরণে, হিংসা প্রশমনে,
আমার মানে, অপমানে, দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মযজ্ঞে!
রবীন্দ্রনাথ আমার ঘুমভাঙা সকালের মুহূর্তে,
সাংসারিক কাজকর্মের শুরু থেকে শেষে,
বহির্জগতের কর্মশেষে গৃহাভিমুখে যাত্রায়,
গৃহে ফিরে একান্ত আলাপচারিতায়, আর
চা-কফি সহযোগে বাকবিনিময়ে!

তুমি শিশুর শিক্ষা শুরুর সহজপাঠে,
কিশোর-কিশোরীর মন গঠনের সুরে-ছন্দে,
যুবক-যুবতীর নিভৃত প্রেমের মুহূর্তে,
প্রৌঢ়ের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতিচারণায়,
আর মৃত্যুপথযাত্রীর মুহূর্ত গণনায়!

তুমি রাখালের গরু চরানোর মাঠে-ঘাটে,
দিনমজুরের নিত্য-প্রতিবন্ধকতা জয়ের উদ্দীপনায়,
আটপৌরে গ্রাম্যবধূর রোজনামচায়,
আর চাষীর শস্য রোপনের শুভ মুহূর্তে!

তুমি গ্রীষ্মে চাতকপাখির করুণ আকুতিতে,
বর্ষায় কালো মেঘের বিদ্যুৎচমকিত ঘনবর্ষণে,
শরতে পেঁজা সাদা মেঘের আকাশ পরিক্রমায়,
হেমন্তে মন্দমধুর তৃপ্তির শুদ্ধ বাতায়নে,
শীতে ধূসর পল্লবের বিমর্ষ অপেক্ষায়, আর
বসন্তে আনন্দমুখর কোকিলের কুহুতানে!

রবীন্দ্রনাথ আমার সকল অস্তিত্বে,
সকল উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায়,
আমার মন-খারাপ করা বিকেল গড়িয়ে গোধূলিবেলায়,
“তুমি না থাকলে কী হতো” এই ভয়ের স্বপ্নভঙ্গে!

তুমি আমার এলোমেলো জীবনের ছন্দ রবীন্দ্রনাথ,
আমি ভাবি বা না-ভাবি, সদা থেকো আমার হাত ধরে!

বন্ধু মনে পড়ে

দেবাশিস মজুমদার

বন্ধু, মনে পড়ে
শাল মহুলের ছায়ায় ঘেরা পুরনো দিনগুলি
মনে পড়ে রঘুনাথপুর, দহিজুরি, লোধাশুলী।
(কেমন করে ভুলি?)

চৈত্রদিনের হাওয়ায় ওড়ে শুকনো ঝরা পাতা
খেলার মাঠ, স্কুলের বাড়ি, পিঠব্যাগে বইখাতা।
বৃষ্টি আসে শ্যামল মেঘে ভেসে
লাল কাঁকড়ের পথটা ভেজে, সাঁওতালী গ্রাম ঘেঁষে।
আকাশপটে উঠল ফুটে পাহাড় সানুদেশ
অস্তগামী সূর্য মাখায় রঙিন আলোর রেশ।

মায়ায় ভরা সেই আলোতে দাঁড়িয়ে আছ তুমি
আর কজনা বন্ধু পাশে, সামনে বনভূমি।

ছবিগুলি সব দেখছি বসে মনেরই অ্যালবামে
এই চিঠিটা পাঠাই তোমায় ঠিকানাহীন খামে।

জানি না কখন কবে / আবার দেখা হবে
শুধু রইল মনে আশা / এই যে ভালবাসা
এরই অটুট বন্ধনে / হাসিতে আর ক্রন্দনে
মিলব আবার কখনো কোনো আকুল সন্ধ্যাতে
জুঁই শেফালি ছড়াবে ঘ্রাণ, চম্পা রজনীগন্ধাতে।

জয় পরাজয়

ডাঃ শান্তনু মিত্র

সাত সমুদ্র তেরোটি নদীর পারে
অচিন দেশের অচিন সে এক রাজা,
সে বীর বিজয়ী, পৃথিবীকে জয় করে
করছে বিরাজ উড়িয়ে জয়ধ্বজা।

ঝলমলে তার রঙিন সে রাজধানী
নর্তকী গানে মাতোয়ারা দরবার
মাথার মুকুটে পান্না হীরক চুনি
মনেতে কিন্তু আহত অহংকার।

চাটুকার ঘেরা সোনার সিংহাসন
সারাদিন চলে বিজয়ের উচ্ছ্বাস
সন্ধ্যাবেলায় সভা হলে নির্জন
অদৃশ্য কেউ করে যেন পরিহাস।

ভয়ানক স্বরে চিরে আঁধারের জাল
কে যেন রাজাকে বিদ্রূপ করে যায়
"আমার কাছে তো হেরে গেছ চিরকাল।
কীসের দম্ভে ভুলে থাকো পরাজয়?"

সীমাহীন ক্রোধে উন্মাদ যেন রাজা
খুলে তলোয়ার করে তাকে আহ্বান
অট্টহাসিতে দিয়ে নির্মম সাজা
সে কণ্ঠস্বর করে অন্তর্ধান।

এহেন শাস্তি ঘটে চলে প্রতিদিন
আহত করে সে রাজার অহংবোধ
"আমি দুর্বার, এ কোন অর্বাচীন?
এ অপমানের নিতে হবে প্রতিশোধ।"

তাই পুনরায় সমর বর্মে সেজে
যত সৈনিক, যত ছিল হাতি ঘোড়া
সব নিয়ে রাজা বের হ'ল তার খোঁজে
"কে আছে জওয়া ন এ জগতে আমি ছাড়া?"

শোভাযাত্রায় শুরু হ'ল অভিযান
পুরভাগে বাজে প্রচন্ড স্বরে ভেরী
ঘোষক সমানে করে চলে আহ্বান
"কোথায় হে তুমি ধৃষ্ট অহংকারী!"

সে এক মিছিল নিষ্ঠুর উদ্ধত
দেশ বিদেশের প্রতিকোণে চারিদিকে
তলোয়ার হাতে খেপা পাগলের মতো
হিংস্র রাজা খোঁজে তার শত্রুকে।

দিনের পরেতে দিন চলে গেল বয়ে
সমুখ সমরে দিল না সে দর্শন
বিষধর যেন রইল অধরা হয়ে
সাঁজের আঁধারে করে যায় দংশন।

পরিশ্রান্ত পরাজিত মহারাজ
নত মস্তকে রথের ভিতরে বসে
ব্যর্থতা তাকে প্রথম ঘিরেছে আজ
সে আস্ফালন হতাশায় গেছে ভেসে।

অবশেষে উদ্ভ্রান্ত সে অস্থির
ফিরে এল দেশে তখন সন্ধ্যা নামে
বর্মবিহীন, মুকুটবিহীন শির
ছুটে যায় রাজা রাজগুরু আশ্রমে।

গোধূলি আলোয়ে হয়েছে সন্ধ্যাপূজা
গুরুজী ছিলেন যেন কোন সাধনায়
বহুদিন পরে নিঃস্ব ভিখারি রাজা
ভেঙে পড়ে সে হাহাকার কান্নায়।

"বলে দাও প্রভু কীভাবে বাঁচব তবে!
নাই যদি থাকে সবার উপরে নাম
বিদ্রূপ শুনে আমাকে চলতে হবে!
এই কি আমার হবে শেষ পরিণাম?

এ জগতে আমি ছিলাম অপরাজেয়
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কোথাও হারিনি আমি
অদৃশ্য থেকে সে করে আমায় হেয়
কোথায় খুঁজব, কীভাবে লড়ব,স্বামী?"

ধীরে চোখ মেলে তাকালেন মহাঋষি
দেখলেন চেয়ে রাজার মুখের দিকে
ঠোঁটে যেন তাঁর স্নিগ্ধ মধুর হাসি
প্রশ্ন করেন "কোথায় খুঁজেছ তাকে?

চিরদিন প্রতিপক্ষ পেয়েছ যত,
জিতেছ তাদের, গর্বে ভরেছ বুক।
একজন আছে হৃদয়ে ছায়ার মতো
সেখানে আত্মসমর্পনেই সুখ।

এতদিন যাকে খুঁজেছ পৃথিবী ঘুরে,
শত চেষ্টায় পেলে নাকো যার দেখা
সে আছে তোমার নিজের অন্তঃপুরে
গোপনে সে কাঁদে মনের পিছনে, একা।

বন্ধ দুয়ারে আঘাত করে সে আজ
দ্বন্দ্ব নয় গো, বন্ধু হতে সে চায়
এ চিরসাথীকে হারিয়ো না মহারাজ
সুখ যদি চাও মেনে নাও পরাজয়।"

মানুষ

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে কিছু গল্প থাকে,
তার মনের কাছে পৌঁছাতে পারলে
তবেই সে গল্পগুলো শুনতে পাবে।

প্রত্যেক মানুষের চোখের কোণে
কিছু অশ্রু জমে থাকে,
তুমি যদি তাকে সত্যিই স্পর্শ করতে পারো
সে অশ্রু কপোল বেয়ে নেমে আসবে
তোমার করতলে।

প্রত্যেক মানুষের একটি গর্ব থাকে
তুমি তার বন্ধু হলে,
সেই গর্ব অনুভব করবে তোমার মধ্যেও।

প্রত্যেক মানুষের বুকের ভিতর
একটা আগুন থাকে,
তুমি তাকে বুকে টানতে পারলে
তবেই সে আগুনের স্পর্শ পাবে।

মানুষের কাছে যাও
মানুষই তোমাকে পথ দেখাবে।

তিলোত্তমা

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

এবার তবে তেমনি করে কাঁদো
বৃষ্টি ঝরার পরে
যেমন করে গাছের পাতা কাঁদে
বহু সময় ধরে!

এবার তবে সারা আকাশ জুড়ে
নাম লিখে দাও তার
যেমন করে কালো মেঘের বুকে
ক্ষণপ্রভার ঝলসে ওঠে আলো।

যেমন করে দুপুরবেলা নিথর পুকুর জলে
বৃক্ষগুলো ছায়া হয়ে ভাসে,
তেমনি করে তোমার হৃদয় মাঝে
তার নামেতে সাঁঝের প্রদীপ জ্বালো।

যেমন করে মাটির গভীর তলে
প্রকৃতি তার শক্তি করে জমা।
তেমনি করে তোমার মনের মাঝে
বজ্র আগুন হয়ে জ্বলুক মোদের তিলোত্তমা।

দেরী

সুশোভন মুখোপাধ্যায়

জানতাম, একটু বেশীই দেরী হয়ে গেছে,
তবু, আশা নিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।
দরজা খুলেও গেল,
বিহঙ্গের ফেলে যাওয়া নীড়ের মতো
শূন্য সে ঘর।

ঘরের ভিতর বাতাসে যেন
ভাসছে কিছু কথা
ভাসছে বুকভরা অভিমান।
কে যেন বলে গেল কানে কানে
এতদিন অপেক্ষায় থেকে,
আমি হারিয়ে গেলাম।

মিষ্টি

বাপ্পাদিত্য

মিষ্টি, যেদিন তুমি হয়েছিলে সৃষ্টি, সেদিন থেকেই ভারি মিষ্টি
যেমন তুমি দৃষ্টিনন্দন, ঠিক তেমনি স্বাদে ও রসনায় আনো তৃপ্তি।
তোমার কত নাম, কত ধাম, কত বাহার, কত দাম!
আজও তুমি একটি আপাত নিরীহ জনগোষ্ঠীর সামাজিক আইকন
দুগ্ধ তোমার মাতা, চিনি তোমার পিতা, আর নলেন গুড় হ'ল তোমার অলংকার।
তুমি সর্বদাই আসো অতিথির হাত ধরে, কখনো বা গৃহকর্তার বাজারের ব্যাগে;
নববর্ষে তুমি, আবার বর্ষ অন্তেও তুমি
উদ্বোধনে তুমি, বিসর্জনে তুমি, আর যখন আসে বিজয়াদশমী,
তখন তোমার বিজয়রথ চলে শরৎ থেকে হেমন্ত।
তোমার সৃষ্টিকর্তারা ওই বলরাম, গাঙ্গুরাম, ভীম নাগ, নকুড়, কে সি দাস পেয়েছে অমরত্ব
শিশুর হাসিতে তুমি, প্রেমিকার সরস চাহনিতে তুমি, প্রেমিকের মন ভোলানো বচনে তুমি
গানে তুমি, সুরে তুমি, পাখির কূজনে তুমি
সকালের সূর্যোদয়ে তুমি, গোধূলি লগ্নে নির্জন সৈকতে সূর্যাস্তেও তুমি
গ্রীষ্মের অপরাহ্নে কালবৈশাখী হাওয়ায় তুমি, শীতের দুপুরে হালকা রোদ্দুরেও তুমি।
আবার পূর্ণিমা তিথিতে, চাঁদের জোৎস্নামাখা রাত্রিতেও তুমি।
ময়রার কড়া নজরদারি সত্ত্বেও তোমার প্রেমের আসন পাতা পিঁপড়ে, বোলতা ও মাছিদের জন্য।
ভোগ-সর্বস্ব বাঙালি তোমায় ডাকে রাজভোগ, কমলাভোগ, মোহনভোগ, সীতাভোগ আরও কত আদরের নামে
একদিকে আছে মধুমেহর চোখরাঙানি, অন্যদিকে মিষ্টি দইয়ের লোলুপ হাতছানি।
নববর্ষ কিংবা অক্ষয় তৃতীয়া, তোমায় বিলিয়ে পাওনাদারেরা বকেয়া আদায় করে কড়ায়-গন্ডায়।
মেলায় তুমি, খেলায় তুমি, পরীক্ষার ফল বেরোলে তুমি, আবার ভোটের ফলেও তুমি
এ যেন, তুমি নেই কিছু নেই, ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়...

মন প্রাণ

বাপ্পাদিত্য

সকালে উঠিয়া শুনি মন কহে প্রাণ, যাও তোমার সাথে আড়ি
প্রাণ কহে, তবে যে এই ভূগোলকে সকল নারী বলে পুরুষেরে,
মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে তাহাদের
আর পুরুষরাও তো বলে ওই একই কথা সময়ে সময়ে
তুমি যদি নাই থাকো আমার সাথে,
তাহলে কী হবে ওই অবলাদের এই ধরাধামে
কবি কহেন, কণ্ঠ আছে, কথার মালা আছে
কিন্তু যদি না থাকে সুর,
সেই দশা দেখা দেবে মনহীন প্রাণে
সবাই এখন নদীতটে অথবা মোহনাতে বিচরণ করে
না আছে সাহস যেতে নদীর উৎসের সন্ধানে
মনহীন প্রাণ তাই দেয় না আর নাড়া
নিত্যদিনের মৃত্যু মিছিল দেখে
সবকিছু কেমন স্থবির হ'ল দিনের আলোর শেষে

সময়

অজয় সাহা

ভাড়ায় খাটা হাফগেরস্থ
ব্যতিব্যস্ত সময় এখন
ভোগের বাসী ঘোর উপোসী
ছটফটে মন কেমন কেমন!

ফ্যাতাড়ু দিন নেশাড়ু রাত
জমজমাটি বন্দোবস্ত
গুছিয়ে রাখা ভব্য সভ্য
খানকীপনায় ধোপদুরস্ত।

সময় এখন বর্ণচোরা
পর্ণ মালায় ঠোঁট চাটে
ধর্ম এখন মানুষ খুঁজে
অঙ্ক কষে ভোট কাটে।

অবশিষ্ট আলো

বাপন দেব লাড়ু

শহরের ভেতর সন্ধ্যা নামলে
রাস্তাগুলো হঠাৎ খুব চুপ হয়ে যায়।
মানুষ তখন মুখে হাসি রাখে,
আর বুকের ভিতর জমিয়ে রাখে ব্যর্থতার শব্দ।
একটা ছেঁড়া ছাতা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে,
বৃষ্টি পড়ে, তবু সে ছায়া দিতে চায়।
আমাদের জীবনও কি তেমন নয়?
ভাঙা স্বপ্নের মাঝেও আশ্রয় খোঁজা।
স্টেশনের বেঞ্চে এক বৃদ্ধ বসে থাকে,
চোখে তার জমে থাকে পুরনো অপেক্ষা।
ব্যাগের ভিতর রাখা একটি কলম
আজও যেন কারও চিঠির আশায় জেগে আছে।
এই পৃথিবীতে কষ্ট সবচেয়ে বিশ্বস্ত,
সে ঠিক সময়ে এসে দরজায় কড়া নাড়ে।
সুখ অনেক সময় ঠিকানা ভুলে যায়,
আর মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে।
তবুও আমি জানি,
সব হারিয়ে গেলেও কিছু আলো বেঁচে থাকে।
কেউ কারও হাত ধরলে,
একটা ছোট্ট স্বপ্ন আবার জন্ম নেয়।
আমি সেই আলো জমিয়ে রাখি শব্দের ভিতর,
যাতে একদিন কারও অন্ধকার সন্ধ্যায়
আমার কবিতা পড়ে কেউ বলতে পারে...
"এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি।"

সোনালী মৌনতা

সুব্রত ভট্টাচার্য

সেদিনের ছায়াপথ রাঙামাটি পথ ধরে দুজনে হেঁটেছিলাম।
সময়ের সঙ্গে হারিয়েছে চেনা মুখ
চেনা পথ খোঁজে না তোমায়,
অজানা ঠিকানায়
সব সুখ।
কতটুকু ব্যবধান, পাড়ি দিতে একই পথ
অসময়ে হেঁটে গেছি
শুধু দুজনায়।

পোড়া চোখ ভুলে যায়, হারানোর কী মানে
মেঠোপথ কি জানে?
কেবলই দৃষ্টি কাঁপায়,
ছেড়ে যাওয়া আঙুলে,
কে জানে কী ভুলে
দূরত্বের পরিধি মাপায়।

কেন বিস্ময় জাগে!
শূন্য বুকেতে লাগে,
অস্থিরতার যত আয়োজনে,
আকাশের বিশালতা জুড়ে আছে নীরবতা –
বাতাসে আসে ভেসে পরিযায়ী পাখিদের ডানা ঝটকানি,
উপেক্ষার পাওয়া সোনালী মৌনতা
নক্ষত্র যেন নিষ্প্রয়োজনে।

হারাই

মালবিকা চ্যাটার্জী

আমরা হারিয়ে যাই অতীতে
হারাই নিজেকে বর্তমানে
ভবিষ্যৎ... সে তো অজানা
তাই হারাবার নেই ভয়।
জীবন'ভর চলে এই মন হারাবার খেলা
নীরবে মেনে নিই সে অমোঘ লিখন।
সেই যে জামগাছে চড়ে
যখন জাম পাড়ার নেশায় মত্ত ছিলাম
তখন তো ভূত ভবিষ্যৎ কোনোকিছুই
মনে হয়নি; শুধু একনিষ্ঠভাবে
জাম সংগ্রহ করেছি। হাত বেগুনি হয়েছে,
হলই বা, ভাবিনি হস্টেলে ফিরে
কোন শাস্তি মেনে নিতে হবে।
তবে আজ কেন সত্যের মুখোমুখি হতে এত দুর্ভাবনা!
আজও ভূত ভবিষ্যৎ ভুলে রুখে দাঁড়ানো দরকার যে!
অতীত বারবার বুঝিয়েছে সততার পথই
নিশ্চিন্ততার আধার,
তাকে আগলে রাখার দায়িত্ব সকল মানবের।
কিন্তু আমরা হারিয়ে যাই অসতের ডামাডোলে।

সর্বনাশী

শঙ্কর তালুকদার

এবার তবে আসি
দিয়েছি তোমায় ফাঁকি
তোমার সাথে ঘর করে
হয়েছি সর্বনাশী।
থাক পড়ে ঘরসংসার
মিথ্যা মোহের কারবার
বিদেশ বিভূঁয়ে ঘুরে
আমায় বলো পরবাসী?
মুখে ফুটেছে খই
আমি আর কেউ নই
নাক চ্যাপটা ঐ মেয়েটা
তোমার এখন সই?
যেদিন ঐ গাছতলাতে
সন্ধ্যা ছায়াঘন
জড়িয়ে বুকে বলেছিলে
আমার সাথে চলো।
মনে পড়ে সেই দিন,
ভাতের সাথে নুন জোগাতে
ঘাম ঝরেছে কত?
এখন আমি পর
পুজোর শাড়ি এনে দিলে
নেই যার কোনো চল।
একাই তবে থাকো
বাপের বাড়ি গেলাম
সাধতে যেও নাকো।

কে আছে

শঙ্কর তালুকদার

চলার পথে চলতে গিয়ে
থমকে কেন গেলে
বৃষ্টি এল পথের মাঝে
ঈশান কোণ বেয়ে।
ওরাই তোমার সাথী ছিল
গল্প কথা বলে
এক ছুটে বেরিয়ে যেতে
পাড়ার দলে ভিড়ে।
মেঘের রাশি একটু হেসে
গুরু গম্ভীর স্বরে
ডাক দিয়ে যায় লুকোচুরির
খেলবে না ওর সনে?
ভয় ভাবনা ছিল না
কেউ ছিল না পর
এখন শুধু নিজের কথা
যত রাজ্যের ভয়।
বাদল ধারা বয়ে যায়
তেমনি বাজে সুর
ঘরের কোণে ফিরবে বলে
মন কেন ব্যথাতুর?
চলার পথে চলতে গিয়ে
হোঁচট কেন খেলে
সকালবেলা ভুলে গেলে
মিথ্যে কিসের খোঁজে?

জোছনা করেছে আড়ি

বৈশাখী চক্কোত্তি

"জোছনা করেছে আড়ি, আসে না আমার বাড়ি"
আজ ফাগুন রাতে পরনে তার ঘন নীল রং শাড়ি
তাতে বুটিতোলা কাঁচপোকা আর জরি
জোছনা করেছে আড়ি।

রূপ তার যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক পরী
বাজুতে কিঙ্কিণী নীল বেলোয়ারি চুড়ি
কপালে নীল শুকতারা টিপ ঝিকিমিকি করি
জোছনা করেছে আড়ি।

আমার ঘর আজ শূন্যতার গন্ধে আছে ভরি
দখিনা সমীরণে তৃষিত অঙ্গ যায় পুড়ি
চাঁদের হাসি আজি নিদ্রাহীন রাত্রে ম ম করি
তবু সে আসে না আর আমার বাড়ি
জোছনা করেছে আড়ি।

মানুষের রঙ-ঢঙ

রঙ্গনাথ

আঁখি দিয়ে দেখতে পাই নানারকম রঙ
তাই মানুষদের রঙ নিয়ে করি ভাগাভাগি –
কিছু রঙ পছন্দ, কোনটা একদম অপছন্দ।
কেউ কালো, কেউ সাদা, কেউ বা বাদামি
সুন্দর-কুৎসিত, হালকা-মোটাসোটা দেখে
বড় গোলমাল মনে হয়, জাগে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

যদি হতাম অন্ধ, রঙ-ঢঙ দেখতাম না
পারতাম না মানুষের বাছ-বিচার করতে –
সকল মানুষ এক রকম, সম-মানের হতো।
যারা নিখুঁত আঁখি নিয়ে দেখে ভাবি
তারা যদি আঁখি বন্ধ করে দেখতে চাই –
খুঁজে পাব না ভেদাভেদ ঠিক অন্ধের মতো।

কিছু প্রশ্ন-ভাবনা

রঙ্গনাথ

আকাশ
আকাশকে প্রশ্ন করলাম, তোমার এত বেশী বিস্তার কেন?
সে তাকাল না; তার কাছে এটা এক অবান্তর প্রশ্ন যেন।

পর্বত
পর্বতকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এত বেশী উঁচু হলে কীভাবে?
বলল সে, নীচে তাকাও, নিজেকে অতি উচ্চে দেখতে পাবে।

নদী
এক নদীকে দেখলাম ছুটে যাচ্ছে, থামছে না কোথাও।
জিরিয়ে নিলে কী ক্ষতি হতো? ছোটো-জিরাও-ধাও!

সমুদ্র
মাছ-হাঙ্গর-তিমি-র জন্য সমুদ্র পেয়েছে পৃথিবীর তিন ভাগ
বাকিটা স্থল, তাও ভাগে ভাগে; এতে অসংখ্য মানুষের রাগ!

পৃথিবী
পৃথিবীটা শান্তি-অশান্তি, যুদ্ধ-সংঘাত নিয়ে এক বিচিত্র স্থান
হেথা রকমারি মানুষের মাঝে সম্প্রীতি-দ্বন্দ-বিবাদ বিদ্যমান!

পিপিলিকা
দেখলাম পিপিলিকা খুব একরোখা, একটু ছুঁলেই দেয় কামড় –
হয়তো ভয় পায়, সবাই তার কাছে যেন নির্দয় পাষন্ড-পামর।

বাঘ-সিংহ
বাঘ ও সিংহকে বললাম, কেন তোমরা বেতমিজ-বদমেজাজ?
বলল, এ না হলে আমাদের মেরেকেটে খেত মনুষ্য-সমাজ।

বাংলাদেশের ভিত্তি ও পরিচয়

রঙ্গনাথ

কেহ কেহ এসব অতীতের ঐতিহ্য-গর্ব-অর্জন মুছে দিতে চায় –
মাতৃভাষা বাংলা, সোনার বাংলা, বঙ্গবন্ধু, ১৯৭১-এর স্বাধীনতা
পতাকা, ৩২ নম্বর যাদুঘর, জয় বাংলা, ১৯৭২-এর সংবিধান।
এই দম্ভ বাংলাদেশের ইতিহাস – অস্তিত্বের উপর তাচ্ছিল্যতা!

রক্তের বদলে বাংলাভাষা সুরক্ষিত, তা কেন চাইব হারাতে?
বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ডাকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি আমরা সবাই
"আমার সোনার বাংলা" গেয়ে স্বাধীনতার কত না স্বপ্ন দেখেছি
১৯৭১-এ, অন্য কিছু নয়, 'জয় বাংলা' বলে করেছি লড়াই!

১৯৬৬-তে গড়া ৩২ নং ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক যাদুঘর
১৯৭২-এর সংবিধান ছিল স্বাধীন দেশ শাসনের এক নকশা –
এসব ছুঁড়ে ফেললে বাংলাদেশ হারায় তার ভিত্তি ও পরিচয়।
নতুন পতাকা নিয়ে যুদ্ধ করেছি যারা, ভাবিনি হবে এ দুর্দশা!

১৯৭১-এ গণহত্যা ঘটেছে – নিহত হয়েছে অজস্র বুদ্ধিজীবী, পুলিশ
সৈনিক, ছাত্র-শিক্ষক, সাধারণ মানুষ; দেখেছি এক চরম বর্বরতা;
নারীরা হয়েছে নির্যাতিত। আপামর জনতা গড়ে তুলেছিল প্রতিরোধ –
একাত্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা এনেছে স্বাধীনতা।

নতুনরা হয়তো ১৯৭১-এর বা অন্য নব্য জালিম মালিক পেতে চায় –
তুচ্ছভাবে মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের ত্যাগ ও চরম আত্মদান
তুচ্ছভাবে লাঞ্ছিত দু'লক্ষ মা-বোন-কন্যার সম্ভ্রম হারানোর ক্রন্দন –
এরা অজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ; শুধু গোলামিতে খুঁজে পায় যোগ্য সম্মান!

ইতিহাস-অর্জন মুছে ফেলা নয় বা অর্জিত স্বাধীনতা হারাবার নয়;
দেশে বন্ধ হোক উগ্রতা, সন্ত্রাস, ভাঙ্গন, পোড়ন, নিধন বা অনাচার;
চাই না ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচার; চাই না সততা-সম্প্রীতি যায় বনবাসে।
মুক্তিযোদ্ধারা পাক ন্যায্য সম্মান, মুক্তিযুদ্ধ হোক সবার অহঙ্কার।

{উৎসর্গ: ৫৫তম স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ, ২০ ২৬}

বেভুল পাখি

বেনজির শিকদার

শীতের শেষে ফাগুন আভায় হলদে মুখখানি
মাঘের ঘাটে বাসন্তীফুল; হাওয়ার কানাকানি;
মুহুর্মুহু সমুদ্র-সাধ ছন্দকাতর আঁখি;
পাখায় মেখে পথের শিশির দেখছে বেভুল-পাখি!
ভোরের নেশায় সেই পাখিটি ইচ্ছে-গন্ধ মেখে
যায় উড়ে যায় দূর অজানায় স্পর্শস্মৃতি রেখে!
দায়ের দহে হৃদ-নিভৃতে বোধের নদী ভাঙে;
অশান্ত মন শান্তি খোঁজে অতল-ডুবের গাঙে!
জলের সাথে মুখোমুখি উষ্ণ কাঙাল শীতে
আকাশ-বাতাস কৌতূহলী প্রণয় কাব্যগীতে;
হাতের রেখায় লেখা বুঝি রংবিলাসী খেলা
বিধুর লগন আড়চোখে চায় বিষণ্ন একেলা।
ভুবনহাটে হরেক সাধের অলীক স্বপ্ন এঁকে
সোনার কাঠি রূপার কাঠির ইন্দ্রজালে ঢেকে;
কে যে কোথায় যাচ্ছে চলে পথের অন্তরালে
উড়াল-চোখে স্থিতি-সোপান সুপ্ত রংমশালে!
রং ছড়িয়ে মন এঁকে যায় মন ছড়িয়ে দেনা
প্রণয়ঘাটে নৌকো ভেড়ে, অলীক লেনাদেনা।
জল-জোছনায় উষ্ণ তুফান ঢেউয়ের মাতামাতি
নিজের হাতেই হাতটি রেখো কেউ কারও নয় সাথী!
তবু কোথাও ওড়ার তৃষায় দাগ রয়ে যায় ভ্রমে
শিশির যেথায় বিক্ষত হয় আরাধ্যজল জমে।
বেলা যখন অস্তে গড়ায় পায়ের কাছে আসি
হলুদবরণ মন-মুনিয়ার মোহন রূপে ভাসি!
বেভুল পাখির ডানায় দেখি সন্ধ্যাছোঁয়া আলো
কানের কাছে কেউ বলে যায় – থেকো কিন্তু ভালো!
থেকো তুমি নিত্যপথে চিত্তে জ্বেলে মায়া
যায় যদি ওই বেভুল উড়ে পাখায় নিয়ে ছায়া!

ক্ষমা

পৃথা চট্টোপাধ্যায়

অপেক্ষার শেষ নেই কোন,
অবিরাম খুঁজে চলা।
সময়ের গভীর মিনারে
কখন যে ভোর হয় সোনালি আলোয়;
সারারাত তোমাকে ছুঁয়েছি ভেবে
অবিরাম আধোঘুমে জেগে থাকি;
করুণ আঙুলগুলি স্পর্শ করে
কোন এক জাদুমন্ত্রে সুর-মূর্ছনায়।
স্বর্গের বাগানে যেন
সুরভিত ফুলের সুষমা।

মৃত্যু ভয় কেন জাগে এমন সকালে!
আজীবন দুঃখ আর ক্ষতচিহ্নে বাঁচা,
প্রশান্তি প্রলেপে তুমি এসো
রেখে যাও হেমন্তের ক্ষমা।

মেহগনি রাতের গান

ডাঃ নিবেদিতা গাঙ্গুলী

এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে,
ওই দেখ না চাঁদ উঠেছে
চাঁদের ঘরে জমছে ধুলো,
ঘুমিয়ে আছে জোনাকগুলো...
রাত নিশুতি জুঁই মালতি
কার সোহাগে ওই ফুটেছে...
এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে...
ওই ছুটেছে, ওই ছুটেছে।

চাঁদের বুড়ি মেঘের ঘরে
বেড়ায় ঘুরে রাত্রি ধরে,
কালপুরুষের কোন ইশারায়
রাত্রি শেষে সব ঝরে যায়,
ঝিলের বুকে কোন সে সুখে
চাঁদের আলো ওই জুটেছে
এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে,
ওই ছুটেছে, ওই ছুটেছে।

চিলেকোঠার বন্ধ ঘরে
স্কন্ধকাটা গুমরে মরে...
অন্ধকারে আপন মনে
মাকড়সাটি জালটি বুনে,
শ্যাওলাধরা ছাদের বুকে
ভালবাসার ফুল ফুটেছে,
এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে
ওই ছুটেছে, ওই ছুটেছে।

ঘুমপরী সব বেড়ায় উড়ে
কড়িকাঠের বুকটি জুড়ে...
কোন বিছানা আদর করে
শরীরখানি জড়িয়ে ধরে,
মেহগনি রাতের গানে
হাজার তারা ওই ফুটেছে।
এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে,
ওই ছুটেছে, ওই ছুটেছে।

এক্কাগাড়ি ওই ছুটেছে,
ওই ছুটেছে, ওই ছুটেছে।

সময়চক্র

শ্রীকুমার রায়

তখন সকাল দশটা
হাতে খাতা বই নিয়ে
একটা আধময়লা প্যান্ট-শার্ট পরে
ছুটতাম স্কুলের দিকে
পড়াশোনা, টিফিন পিরিয়ড
হেড স্যারের চোখরাঙানি
আবার ভালবাসারও হাতছানি।
বিকেল সাড়ে চারটে
কতরকম বন্ধু খেলার মাঠে।
ফুটবল ভলি ডাংগুলি, চোর পুলিশের খেলা
এইভাবেই কাটত আমাদের বিকেলবেলা।
সন্ধ্যা সাতটা
টিমটিমে আলোতে সবাই মিলে পাঠে, নেই আড্ডা
আছে আনন্দ, খুশি আর হাসিঠাট্টা।
এই সেদিনের ঘড়িতে সকাল আটটা
তাড়াতাড়ি তৈরি, নাওয়া খাওয়া
হাতে অ্যাটাচি, টাই স্যুট বুট অফিস যাওয়া
সারাদিন অফিস, মিটিং, কাজে একাগ্রতা
টেলিফোনে, ফাইলে ছয়লাপ, ভীষণ ব্যস্ততা।
কোথাও ধর্মঘট, কোথাও বা ছাঁটাই
শ্রমিক মালিকের দ্বন্দ্ব মেটাতে দিন সাফাই,
বহুদিন টিফিনে হয়েছে কামাই।
ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরা, রাত নয়টা
গম্ভীর মুখ গিন্নির, কথা আর কয় না।
এভাবে কেটেছে প্রায় ৩৪টি বছর
এখন চলছে জীবনের অবসর।
ঘুম ভাঙ্গে সকাল নয়টা
ব্রেকফাস্ট সকাল দশটা
খবরের কাগজ, টিভি আর লেখক বন্ধুদের আড্ডা
দুপুরের লাঞ্চ বেলা দুইটা।
রাতেও নেই কোন তাড়া
এর মধ্যে জীবনসঙ্গিনী ছেড়েছে আমাদের সবার মায়া।
পেছনের সব অতীত এখন ইতিহাস
অনাগত ভবিষ্যৎ করে এখন উপহাস।

নামহীন একটা মেয়ে

তুহিনা সুলতানা

আমার... কোনো নাম ছিল না।
ছিল কেবল কিছু উচ্চারণ –
রানু, টুনু, পিংকি, গুড়িয়া...
যেন আমি শুধু একটুখানি আদর,
কখনও বিরক্তি,
কখনও শুধুই ডাকনাম!

স্কুলে গিয়ে জেনেছি –
আমার একটা নাম আছে নাকি!
রেজিস্টারে লেখা –
বাবার নামের ছায়া ধরে বেঁচে থাকা আমি।
কিন্তু সে নাম,
কখনও কেউ ভালবেসে ডাকেনি।

আমি মেয়ে।
আমার পরিচয় শুরু হয় অন্যের থেকে –
"বাবার নাম কী?"
"ভাই আছে?"
"বিয়ের পর তোমার পরিচয় কী?"
নিজের নাম কোথাও ছিল না!
জন্মসূত্রে পেয়েছি শুধু এক নিঃশব্দ অনুপস্থিতি।

আমার পুতুলের নাম ছিল।
তার জন্য গল্প লিখেছি, গান গেয়েছি।
কিন্তু নিজের জন্য?
নিজের অস্তিত্ব কখনও পাত্তা পায়নি
কোনো গল্পে, কোনো ছন্দে।

আয়নায় দাঁড়িয়ে
চোখের ভেতর খুঁজি নিজেকে –
কোথাও মায়ের মুখ,
কোথাও বাবার নাক।
কিন্তু আমি কোথায়?
আমার নিজের মতো কিছু কোথায়?

একদিন... খুব নিঃশব্দে
নিজেকেই একটা চিঠি লিখেছিলাম –
'তুই তো কারও নাম না,
তুই তো নিজেরই হয়ে ওঠিসনি কখনো!
তোর কণ্ঠেও তো কেউ ডাকে না ভালবেসে,
তোর চোখে চোখ রাখে না কেউ!'

সেদিন বুঝেছি –
নাম মানে কেবল শব্দ নয়,
নাম মানে এক টুকরো সত্তা
নাম মানে
নিজেকে চিনে ফেলার এক অনন্য পরিচয়!

সেদিনই
নিজের জন্য একটা নাম বানিয়ে নিয়েছিলাম আমি –
না, কেউ দেয়নি,
আমি নিজেই গড়েছিলাম –
নিজের স্বর, নিজের ছায়া, নিজের ধ্বনি দিয়ে।

এখন আর আমি নামহীন নই –
আমি 'আমি',
আমার নিজের নামের উচ্চারণে
আজও বাজে জীবনের জয়ধ্বনি।

বিপরীত সমীকরণ

তুহিনা সুলতানা

এ জীবন এখন নিঃসঙ্গতার জলে ধোয়া –
তোমায় ছাড়া পথ চলাই যেন
আমার একমাত্র প্রাপ্তির পাঠ।
সঙ্গহীন ঋতুগুলোর নিস্তব্ধতায়
জ্ঞান জন্মেছে, প্রজ্ঞা পেকেছে,
আর হৃদয় শিখেছে –
ভরসা মানে ভাঙার শব্দও হতে পারে।

প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি আজ আর আলো নয় –
একটুখানি ছাই,
যা হাত বাড়ালেই বাতাসে উড়ে যায়।
কোথাও কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শুধুই ধূসর কুয়াশায় ডুবে থাকা
একবেলার তীব্র নিঃসঙ্গতা।

অভিমান এখন নদীর মতো স্থির –
স্রোতহীন, বৈঠাহীন, অনাদরে শুকনো।
রাধার মন কি আর সেখানে আসে?
এমন এক নৌকায় নেমে
তুমি তো বহু আগেই সরে গেছ,
আমিই কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম
অদৃশ্য তীরের পাশে
অপেক্ষা আর অনুপস্থিতির মাঝামাঝি।

ভালবাসার নাম উচ্চারণ করলেও
দ্বিধার কাঁপুনি জেগে ওঠে –
বিশাখা নক্ষত্রও যে আজ
আমার আকাশে ওঠে না।
রূপকথারা গুছিয়ে নিয়েছে
তাদের শেষ রাতের আলো,
আমার কাছে রেখে গেছে
একপুঞ্জ শুকনো নির্জনতা।

তোমার সাথে নয় –
এখন পানকৌড়ির ডানায় দেখি
শুধু ফিরে যাওয়ার আকুলতা,
রাজহাঁসের সাদা গায়ে দেখি
দূরে মিলিয়ে যাওয়ার অভিমান।
বিকেল আর দুরন্ত নয় –
এখন তা গভীর নীরবতার মতো
কুয়াশার গায়ে আঁচড় কাটে।

এক জন্মও নয় –
আমরা দুই বিপরীত দিগন্ত,
যারা পাশাপাশি থেকেও
স্পর্শহীন থেকেছে চিরকাল।

জন্মদিনগুলোও এখন
নিজেকেই জ্বালাই নিজের মোমে –
নিভে যাওয়া আলোয়
চোখ রেখে মনে বলি –
'সমীকরণ বদলে গেছে।
এবার আমার পাশে থাকবে
শুধুই আমি...
আর আমার দীর্ঘ, নিঃশব্দ সাহস।'

তাতে ভারি বয়েই গেল

তুহিনা সুলতানা

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
একদিনের ক্লান্ত চাদর মুছে
আয়নায় তাকাতেই দেখি,
একটা মেয়ে এখনও ভিতরে বেঁচে আছে –
যে মেয়েটা কারও অনুমতি নয়,
শুধু একটু আলো খুঁজে বেড়ায়।

তাই আজকাল কাজল পরি।
চোখের কোণে জমে থাকা দীর্ঘ রাতগুলো
কালো রেখায় সাজিয়ে বলি –
'দেখো, আমি এখনও হারাইনি।'
ঠোঁটে লিপস্টিক ছুঁইয়ে দিই
যেন নিজের মুখেই রঙ ভরে দিই –
কারণ রঙের জন্য কখনোই
বয়স লাগে না।

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
যখন জিন্স পরে হাঁটতে শুরু করি,
মনে হয় এক টুকরো বাতাস
আমার আশেপাশে ফিরে আসে।
লোকের চোখে ন্যাকামি হোক,
তাদের কথায় ধুলো উড়ুক –
আমার কাছে এই পোশাক
নিজেকে নতুন করে জানার
সবচেয়ে নরম উপায়।

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
ইন্টারনেটের আলোয় শিখেছি
একা থেকেও কত মানুষকে ছুঁয়ে যাওয়া যায়।
ফেসবুকের পুরনো স্মৃতি,
হোয়াটস্অ্যাপের নতুন শুভেচ্ছা,
অচেনা বন্ধুর গল্প –
সবই আমার দিনকে একটু উজ্জ্বল করে।
আদিখ্যেতা?
হয়তো ওদের চোখে –
কিন্তু আমার কাছে এটাই
নিজেকে আবার জীবন্ত করে তোলার ভাষা।

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
যেদিন ঘরে কেউ সময় দেয় না,
সেদিন একা একা চলা রাস্তাগুলো
আমার হাত ধরে হাঁটায়।
সিনেমার আসনে একা বসে,
স্ক্রিনের আলোয় নিজের সঙ্গে
নতুন এক সম্পর্ক গেঁথে তুলি।
শপিং মলের কাঁচে
নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে ভাবি –
'আমি তো এই মানুষটার সঙ্গেই
সবচেয়ে বেশি সময় কাটাই।'

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
বৃষ্টিতে ভিজলে বুঝি,
জলে ভিজে গেলেও
আমার মন ভাঙে না।
সন্ধ্যার লালচে আলোয়
ছাদের রেলিঙে দাঁড়িয়ে দেখি –
একটা দিন ঝরে গেলেও
আমার ভিতরের বয়স
একটুও বাড়েনি।

মধ্য পঞ্চাশের এই আমি –
অভিমান, ক্লান্তি, অবহেলা –
সব পেরিয়ে শিখেছি
ভাল থাকার পথটা নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়।
নিজেকে ভালবাসা
স্বার্থপরতা নয়,
এটা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কৌশল।
জীবন যখন হাতে হাত রেখে চলে না,
তখন নিজের হাতটাই শক্ত করে ধরতে হয়।

লোকে যা খুশি বলুক –
বারো হাত দূর থেকে বিচার করুক
তাদের কথার ওজন
আমার কাঁধে রাখা নেই।
আমি আমার মতো চলব,
আমার মতো সাজব,
আমার মতো বাঁচব।

কারণ দিনের শেষে
আমি জানি –
নিজেকে নিয়ে সুখী হওয়াটাই
সবচেয়ে বড় সাহস।

আর বাকিটা?
হেসে বলি –
তাতে ভারি বয়েই গেল।

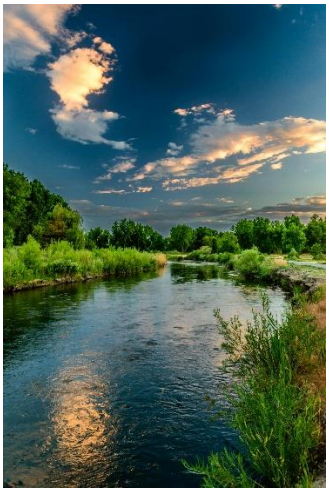

যোজন অনুভূতি

কৃষ্ণা গুহ রায়

নির্জন নদীর ঘাটে চুঁইয়ে নামে ছাই রঙের সন্ধ্যা,
রাধাচূড়ার ডালে পাখপাখালির উপচানো সুখের সংসার,
এই ঘাটেই মহাকাব্যের নারী ভাসিয়েছিল কুমারীবেলার সন্তান,
তারপর কত যে যুগ কেটে গিয়েছে,
এখন নদীর পাড়ে ইঁটের ভাঁটা,
কত মেয়ের লজ্জা আজও শ্যাওলা হয়ে ভেসে বেড়ায়,
কৃত্রিম সমাজের বেহায়াপনায় স্বচ্ছ জলে আবর্জনা বাঁধে বাসা,
বয়স্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধির পূর্ণতায় সে এখন বিগত যৌবনা,
একসময়ে কলকলানো জলে নাব্যতা ক্রমহ্রাসমান,
শুধুমাত্র মাঝির বেদুইন মনের বিনুনি ধারায়
মিলেমিশে এক হয়ে যায় নদীর সুখ দুঃখের
যোজন যোজন অনুভূতি।

সংঘাত

পারমিতা বসু

প্রতিদিন মোরা সকাল বেলায় কত আশা নিয়ে জাগি,
কত আবেদন কত প্রয়োজন সব কিছু নিয়ে ভাবি।
দিন কেটে যায় সময় ফুরায় কতটুকু মোরা পাই,
তাও ছাড়ি না, আশার আশায় সবটুকুই তো চাই।
মন যে মোদের হয় না তো বশ বুদ্ধির কাছে কভু,
এত চাহিদার কিবা প্রয়োজন বলে দাও তুমি প্রভু।
প্রতিদিন যদি কর্মের কথা ভেবে চলি মোরা সবে
এত সংঘাত, এত দুরাচার রবে না তো এই ভবে।
পৃথিবী জুড়ে চলেছে যে নির্দয় হানাহানি,
দম্ভ আর ক্ষমতার জোরে মানুষ করছে জানি।
সংহার কেন করছ না তবু তুমি আজ প্রভু,
নিরীহ মানুষ মৃত্যু বরণ করিতেছে আজ তবু।
পাশব হিংসা মানুষকে যেন পাগল করেছে আজ,
ছোট বড় কত ঘটে চলেছে হিংসাত্মক কাজ।

পুরাতন

পারমিতা বসু

পুরনো হলে সবাই এখন তাকে পাল্টে ফেলে,
হাজার নতুন মিলছে তাই যুগের সাথে চলে।
ভাবছি তাই বদলে নেব জংধরা এই মন,
বুঝি না যে কোথায় দেব এর বিসর্জন।
সব সকালেই ভাল থেকো চাইছে আমার মন।
সবাই আমরা সবার তরে হই যে আপনজন।
ভেবে দেখতে গেলে কিন্তু সবাই নয় এমন,
পুরনো সব ভালবাসি আমরা পুরনো জন।
পুরনো সূর্য, পুরনো চাঁদ বহাল তবিয়তে,
এখনো মন ভরিয়ে তোলে সকালে ও রাতে।
নতুন দিনেও পুরনো সূর্য আলোয় আকাশ ভরে,
আবার আসে পুরনো চাঁদ রাতের আকাশ পরে।
পুরনো গান, পুরনো সুর নিয়ে যে যায় দূরে,
সেই পুরাতন সুখের স্মৃতি দিনগুলো মোর ভরে।

আসল নকল

পারমিতা বসু

আজকাল দেখি বেশি যেন আঁকা ফুলের কদর
ফোটা ফুল তো শুকিয়ে যাবে তাই পায় না আদর
আসল থেকে দাম বেশি পায় যারা এখন নকল
একগোছা ফুলের চেয়ে তার ছবির দাম ডবল।
মানুষও আজ হচ্ছে নকল, কদর পায় তারাই,
সৎ-স্বভাব মানুষের বড় অভাব দেখি তাই।
নকল সোনায়, নকল দ্রব্যে ছেয়ে আছে বাজার
কিনছে সবাই সেসব কিছু করছে খরচ হাজার।
আসল নকল তফাৎ বোঝা নয় যে এখন সহজ
দাম পাচ্ছে নকল জিনিস ধুচ্ছে সবার মগজ।

সময় চোর

পারমিতা বসু

ভাবে না কেউ সময় কেন যে কমছে
কাজ তো সবার আগের মতোই চলছে।
তাও যেন সময় পাওয়া
মনে হয় চাঁদে হাত দেওয়া,
অনেক ভেবে বের করলাম,
আসল চোরের খোঁজটা পেলাম।

একবার যদি ফোন হাতে আসে
অবকাশ যেন কাটে উল্লাসে,
কোথা দিয়ে যেন সময় পালায়
বুঝতে দেয় না সব সে ভোলায়,
তারপর দেখি সময় পাওয়া
হয়ে যায় যেন কম।

বুঝেও তবু ছাড়া তো যায় না
অভ্যাস ধরে বড়ই বায়না।
কত অসহায় হয়ে গেছি মোরা
জীবনটা হবে এভাবেই সারা।

কিছু স্মৃতি

স্যমন্তক দত্ত

টুথপেস্ট:

আমার মা, ঠাকুমা সবাই রামদেবজীর শিষ্য ছিলেন | কেটে গেলেই গ্যাঁদাপাতা, পেট খারাপ হলে মৌরি-মিছরির জল আর বাতাসার মধ্যে পেঁপের আঠা | জ্বর হলে শিউলি পাতার জঘন্য ঘন রস | কী খেয়েছি আর কী খাইনি! 'না' বলার মতো ক্ষমতাই ছিল না |

বয়স বাড়ল, আমার সহোদরা ভগিনী বড় হ'ল | স্কুলে তার বন্ধুরা সবাই টুথব্রাশ ব্যবহার করছে; তার ভারি কষ্ট, কারণ মায়ের হিসেবে ছিল কয়লার ছাই সরষের তেল আর নুন দিয়ে সকালে দাঁত পরিষ্কার করাটা সবথেকে স্বাস্থ্যকর | আমাদের বাড়ির উঠোনে কয়লার উনুন ছিল | সেখান থেকেই সকালে কয়লার গুঁড়ো নিয়ে আসতাম |

দুর্গাপুজোর সময় মা আমার বোনকে বলতেন, "কী কী পেলে তোর জীবনে সবচেয়ে আনন্দ হবে লিখে আমায় দে | আমি ঠাকুরকে বলব |"

সে একটা বড় লিস্ট দিত | তার শুরুতেই থাকত টুথব্রাশ আর সব শেষে থাকত 'আমাকে এক্সকারশানে যেতে দিতে হবে'| এ দুটো কবে যে সে পেয়েছিল মনে নেই | আমার ধারণা, হয়তো যেদিন মা ওর জন্য অ্যাপ্রুভ করেছিলেন সেদিন থেকে আমিও টুথব্রাশে উত্তীর্ণ হই |

তারপর থেকে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ক্রীতদাস হয়ে যাই আমি | কোনটা মিষ্টি, কোনটা ঝাল, কোনটা নোনতা, কোনটা তেতো, কোনটায় এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে, কোনটা ব্যথা কমায়, কোনটায় ক্যালসিয়াম মেশানো, কোনটায় পেপারমিন্ট বেশী, কোনটা আবার পাউডার | বেচারা আমাদের দাঁত! কত পরীক্ষার সাক্ষী! তবু আজও হাড় চিবোচ্ছি | সব সেই কয়লার ছাইয়ের গুণ!

মদের দোকান:

ফৌজ থেকে রিটায়ার করার পরপর আমি থাকতাম যোধপুর পার্কে, কারমেল ইস্কুলের কাছে | উল্টোদিকে দাশগুপ্তর মদের দোকান ছিল | ঘুপচি একটা লোহার শিকওয়ালা জানলা | রোজ সন্ধ্যেবেলা ভিড় হতো | আর শুক্র শনিবার তো বলার নয় | মারামারি, খিস্তি খাউর, ধাক্কাধাক্কি; কেউ নর্দমায় পড়ছে, কেউ বিবেকানন্দের মতো মতামত দিচ্ছে | কেউ আবার রাজা উজির মারছে | প্রতি তিনমাস অন্তর চুরি হতো | মদের দোকানের রড কেটে মদ চুরি |

সেখান থেকে মদ কেনাটা মোটেই সোজা ছিল না | বহুক্ষণ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরে প্রথমে জানলা; একটা ছোট্ট ফুটো, যা হোক করে হাত ঢুকিয়ে পয়সা দেবার জন্য | এরপর রসিদ নিয়ে পরের জানলা | এটা আরও মোটা রডের | মানুষের ঘাম আর হাতের নোংরা লেগে কালো হয়ে গেছে | এইখানে পেমেন্ট রসিদ দেখালে মদের বোতল বার করে দেবে তারা | ঘন্টাখানেক পর স্বস্তির নিঃশ্বাস! হাতে বোতল, ব্যাগে চানাচুর! ব্যস, বাঙালি বাংলা বিহারের রাজা!

উত্তর ভারতে মদের দোকানের চরিত্র আলাদা | খোলামেলা | সব ভ্যারাইটি পাবেন | বিলিতি স্কচ থেকে রাম | আপনি দোকানে ঢুকুন, মদের বোতল তুলুন, কাউন্টারে পয়সা দিন – ল্যাঠা চুকে গেল; মারপিট নেই, লাইন নেই, লোহার গরাদ নেই | প্রতিটি দোকানের পাশে একটা ছোট দোকান – দেশী মদ | প্রত্যেক দোকানের পাশে একটা চানাচুরের গর্ত | কলকাতার এক বন্ধু বললেন "এটাই উন্নতির লক্ষণ |" কে জানে!

বয়সকাল:

জীবনে বুড়ো হবার মতো আনন্দ আর নেই | যতদিন অল্প বয়স থাকে ততদিন মনে মনে একটা সংগ্রাম থাকে | হয়তো আরো বড় অফিসার হতে পারি | হয়তো এয়ার মার্শাল হয়ে যাব | হয়তো বা ওপরওয়ালা আমাকে খুব পছন্দ করবেন | কোন কাজটা তেনার মতো করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন ইত্যাদি নানান ঝক্কি!

পরে আবার ভাবতাম কেন যে সেনাবাহিনীতে ঢুকলাম! দিল্লির হংসরাজ কলেজে আমার সঙ্গে পড়ত রাওয়াত; লেখাপড়ায় লবডঙ্কা | পাস করে গেল IPS পরীক্ষায় | তারপর বোলপুরে SDPO হয়ে গেল | আমি ভাবলাম যাঃ, আমি কোথায় রাজস্থানে গঙ্গানগরে পড়ে আছি | পরে উপলব্ধি করলাম ভাগ্যিস IPS হইনি, নইলে অমানুষ অনুব্রতর আদেশে চলতে হতো |

এদিকে আমার কিন্তু সকলের সাথে কম্পিটিশন | সব বিষয়েই সকলকে টপকে যাব, এই ইচ্ছে ছিল |

বেরেলিতে আমার সাথে মুখার্জি বলে একজন হাসিখুসি অফিসার ছিল | মেসে পার্টি হলে সারারাত নাচত | তাকে আমরা ডাকতাম 'মুখস'(Mukhs)| তার সাথে গেলাম আগ্রায় | প্যারা ট্রুপার হতে | বার দশেক লাফিয়ে পড়ার পর আমার বাঁ হাঁটুতে কনকনিয়ে ব্যথা | ব্যস, আমি আউট! মুখার্জি বরাবরের জন্য আগ্রায় পোস্টেড হয়ে গেল | প্যারা জাম্প ইস্কুলে মাস্টার | আমি ভাবলাম আমার জীবনটা বৃথা হয়ে গেল | ভগবান যা দিচ্ছেন তাতে কখনোই আমি খুশি নই | কী ঝামেলা!

মজিলপুরে আমাদের দুখানা বিশাল বাড়ি | পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে পাঁচখানা শান বাঁধানো পুকুর ছিল | মাস্টার হয়ে বাবা শান্তিনিকেতনে গেলেন | গুরুপল্লীতে দুটো ছোট ছোট ঘরসহ একটা বাড়িতে থাকতাম আমরা | এদিকে দেশে ঠাকুরদা মারা যেতে কাকা সব চুরি করে নিলেন | আজ শুনি আমগাছ বেচে দিয়েছেন, কাল হলঘরের বিলেতি কার্পেট উধাও | পরে বাড়ির চারদিকে বাংলাদেশী মুসলমান ভরে গেল | আজ আম চুরি করে, কাল পুকুরের মাছ তুলে নেয় | রোজ থানা-পুলিস | সে এক কান্ড!

আজ বুঝি, ভগবানের ইচ্ছে বোঝা দায় | আর বুঝি এই পরিণত বয়সে উদাসীনতার মজাই আলাদা! পৃথিবীতে একমাত্র সম্পদ 'শান্তি'| শান্তি মানে জীবনে যা পাচ্ছ তাতে খুশি থাকো | মেনে নাও | আত্মসমর্পণ করো | তোমার যা পাবার তাই তুমি পাবে, একরত্তি বেশি পাবে না, একরত্তি কমও নয় | বাকিটা ভোগে যাবে – তাই বেশি চেয়ো না, বেশী খেও না; পেট খারাপ হবে!

মানুষের স্মৃতি:

মানুষের স্মৃতি নিজের স্বার্থে | যে কাজ হয়নি, যে পরীক্ষা বাকি আছে, যে পরীক্ষাতে ফেল করেছি, যার কাছে মার খেয়েছি সেইগুলো জমিয়ে রাখে | কত পরীক্ষাতে পাস করলাম, কত সুন্দর সুন্দর প্রেম করলাম, সেগুলো কিন্তু মনে নেই | যে বিয়ে ভেঙে গেছে, যে চাকরি থেকে ঝগড়া করে কাজ ছেড়েছি তার সব মনে আছে | রোজ সূর্যোদয় হয়, কত রঙিন | কটা মনে রেখেছি? বহু বছর আগে জয়সালমিরে থাকাকালীন সব সূর্যোদয় অদ্ভুত স্মরণীয় লাগত | আজ কি সেসব মনে আছে? নেই |
J Krishnamurthy বলেছেন "Memory is the scar of incomplete actions. The action that completes gets deleted."
প্রশ্ন হ'ল | যদি আমি কিছুই অর্ধসমাপ্ত না ভাবি, সব যদি পরিপূর্ণ হয়েছে ভাবি তবে? তাহলে আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে | ব্রেন এবার কাজ করবে না |

তাই আমরাও সমস্যা খুঁজি | মানুষের মাথার একটা কাজ সমস্যা হাতড়ে বেড়ানো | ৫০ বছর বয়সী শাশুড়ি সংসার করে, ঝগড়া করে ক্লান্ত; তবুও বউমার দোষ ধরবে, সেটা দেখে নিজের দুঃখ বাড়াবে | কারণ সেটাই মানুষের স্বভাব | যদি বউমার দোষ না থাকে তো শাশুড়ি হয়তো মারাই যাবে | জীবনে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকবে না | বেঁচে থাকার আনন্দ 'দুঃখে'|
আমি ক্লাস টেনে পড়ার সময় ইস্কুলের Fete-এর দিন (আমরা আনন্দমেলা বলতাম) ক্লাস ইলেভেনের সমর কাঞ্জিলালের হাতে মার খেয়েছিলাম | আজও ভুলিনি | কিন্তু সমর কাঞ্জিলাল (সে হৈ হৈ করে বেঁচে আছে) সে ঘটনা মনেই রাখেনি | আমার সব মনে আছে – কোন গালে চড় মেরেছিল, কতটা লেগেছিল, তারপর আমি কী করলাম | কোথায় গেলাম, কে প্রিন্সিপাল ছিলেন, তাঁকে কী বলেছিলাম | সব মনের কোণে গাঁথা |
তাই সমস্যায় বাঁচুন, দীর্ঘদিন বুদ্ধি রেখে বাঁচুন |

ট্রেন-যাত্রা:

বোধহয় গত জন্মে ট্রেনে হকার ছিলাম, ফলে এ জীবনেও ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে কত যে সময় কাটাতে হচ্ছে বলার নয় | অবশ্য প্লেন আর ট্রেনের মধ্যে আমার ট্রেনই বেশী পছন্দ | ট্রেন আর বাসের মধ্যে বাস!

একবার আমেরিকাতে দেশ দেখব বলে সস্ত্রীক টেক্সাস থেকে চিকাগো অবধি গ্রে-হাউন্ড বাসে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম | রাতের পর রাত লেগেছিল | ভারতে বাস যাত্রার তত প্রথা নেই, তাই ট্রেনেই বেশিরভাগ জায়গা দেখে নেওয়া যায় |

ছেলেবেলায় শান্তিনিকেতন থেকে প্রতি গরমের ছুটিতে যেতাম মাতামহের বাড়ি কালিম্পং-এ | সকরিগলি আর মণিহারি ঘাটে ট্রেন থেকে নেমে বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে স্টিমারে উঠতে হতো, যদি ছেড়ে যায়! তারপর

স্টিমারের ডেকে বসে চিকেন কারি, ভাত! আমার হবু শাশুড়িকে এই স্টিমারেই প্রথম দেখি। ওপর তলায় ফার্স্ট ক্লাস আর নিচে সেকেন্ড ক্লাস ছিল। ওপর তলায় ডেকের ওপর সোফা আর নিচে কাঠের বেঞ্চ।

পরবর্তী জীবনে দিল্লীতে পড়ার সময় আমার খুব প্রিয় জার্নি ছিল আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস; যেহেতু অন্য কোন ট্রেন দিল্লী থেকে সোজা শান্তিনিকেতন যেত না। আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ধিমিয়ে ধিমিয়ে বিহার, সাঁওতাল পরগনা পেরিয়ে থামতে থামতে বোলপুরে এসে পৌঁছাত। দরজা বন্ধ হতো না, জানলা হাট করে খোলা থাকত। প্রায় অন্ধকার কামরা, কোথাও দাঁড়িয়ে গেল তো দাঁড়িয়েই গেল, চলার নাম নেই। ট্রেনের ভেতর অন্ধকার বাইরের ইস্টিশনের টিমটিমে আলো খোলা জানলা দরজা দিয়ে ভেতরে আসত। একবার পাকুড় ইস্টিশনে দু'রাত্রি আটকে ছিল। হ্যাঁ, দু'রাত্রি। জ্যোতিবাবু দুদিনের 'বাংলা বন্ধ' ঘোষণা করেছিলেন। আমি ছাত্র, পকেটে পয়সা নেই, কী করি, শেষে HMT হাতঘড়িটা পাকুড় ইস্টিশনের পানওলার কাছে বিক্কিরি করে মনের আনন্দে দু'দিন পাকুড়ের পাহাড়ে কাটিয়েছিলাম।

তবে একবার মাইসোর এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাসে মাদ্রাজ থেকে মাইসোর গিয়েছিলাম, তার তুলনা ছিল না। প্রতিটি ফার্স্ট ক্লাসের কামরা আলাদা আলাদা বগি। ঘরের পাশে বিশাল attached একটা washroom ছিল। তাতে এক কোণে চানের শাওয়ার, অন্য কোণে বিলিতি কমোড, কমোডের পাশে খোলা জানলা, পাহাড় দেখতে দেখতে কৃতকর্ম করা যেত। আহা কী সুন্দর যে ছিল সেই রাস্তার দৃশ্য! আজকাল খুপরি খুপরি ঘরে, বন্ধ পরিবেশে ট্রেন যাত্রার সেই আনন্দ আর নেই।

আমার আবার সহযাত্রী ছাড়া ট্রেন ভাল লাগে না। কত যে প্রেম ভালবাসা, ঠিকানা আদান প্রদান করতাম। তারপর ট্রেন থেকে নেমেই সব ভুলে যেতাম।

দোদুল্যমান বঙ্গবাসী:

কাল আমি আমার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞেস করলাম "দাদা, ছেলের প্রমোশন হ'ল খাওয়াদাওয়া কই?" তিনি মুখ লম্বা করে বললেন, "আর বলবেন না, প্রমোশনটা ঝুলে আছে। বস ভাল নয়।" নমস্কার করে চলে গেলাম।

পরের মোড়ে দেখি পাড়ার ঘোষ গিন্নি। "এই তো দিদি, মেয়ের বিয়ে ঠিক?" তিনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, "কোথায়? ছেলের বাবা সব ঝুলিয়ে রেখেছে, না-ও বলে না, হ্যাঁ-ও বলে না।'

বুঝলাম, এ দেশে সব কিছুই ঝুলছে – বিয়ে, প্রমোশন, চাকরি সব। প্রেমে পড়ে প্রেমিক ঝুলছে। চাকরির আশায় বেকার ঝুলছে। ফলের আশায় ছাত্র ঝুলছে। মলের আশায় পেট পাতলা বঙ্গবাসী ঝুলছে। ঝুলতে অবশ্য ক্ষমতা লাগে। ত্রিশঙ্কু হওয়াটা সোজা ব্যাপার নয়। সেই গল্পটা জানেন তো, যে মর্ত্যেও মরবে না, পাতালেও মরবে না? তাকে কৃষ্ণ ভগবান নিজের কোলে রেখে মেরেছিলেন! বোঝা গেল ঝুলে থাকাটা কর্ম বটে, ধর্মও বটে। সুতরাং এদিক ওদিক না তাকিয়ে ঝুলে পড়ুন।

রাস্তার মোড়ে জটলা

উঁকি মেরে দেখি এক রিকশাওয়ালা একজন বৃদ্ধ মানুষকে প্রবল ধমকাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ভাড়া নিয়ে গন্ডগোল। কাছে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললাম, দাদা, বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে দুটো চারটে টাকার জন্য খারাপ ব্যবহার করছেন কেন? যাই হোক সমস্যাটা মিটিয়ে নিন।

রিকশাওয়ালা আমাকে কড়া স্বরে বললেন, শুনুন, দু চার টাকার ব্যাপার এটা নয়। জানেন উনি আমাকে চরম অপমান করেছেন!

- কেন, কী বলেছেন উনি?

- আমাকে বলে কিনা, ভাইপো, এই যে তোর পয়সা নে!

- তো? এতে অপমান কোথায় করলেন?

রিকশাওয়ালা এবার আমার দিকে রোষানলে তাকিয়ে বললেন, দেখুন মশাই, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ঝরিয়ে রোজগার করে পেট চালাই। কখনো কারো এক আঁটি খড়ও চুরি করিনি। আমার বৌ কি সোনা পাচার করেছে? নাকি আমি বাড়িতে চলন্ত সিঁড়ি বসিয়েছি যে আমাকে কেউ 'ভাইপো' বলে ডাকবে?

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম ভিড় করে থাকা মুখগুলো কেমন যেন থ মেরে আছে। বৃদ্ধও যেন কাঁচুমাচু মুখে অপরাধবোধে ভুগছেন! বুঝলাম, এ হচ্ছে প্রবল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও নীতিগত প্রশ্ন। এসব গভীর সমস্যা মেটানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সটকে পড়লাম!

সৈন্য-জীবন:

আমাদের যুগে মোবাইলে ক্যামেরা ছিল না। সুতরাং এখনকার মতো সর্বদা হাতে ক্যামেরা থাকত না। তাই ছবি তোলার একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হতো। আজও ট্রেকিং-এ গেলে পেছনে পেছনে ক্যামেরা-ম্যান নিয়ে যেতে হচ্ছে।

সে যুগে একটা পাহাড়ে নিজে উঠে গেলেই হবে না, উঠে ক্যামেরা-ম্যান চাই আপনার এই মহান কর্ম ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখতে। ক্যামেরা-ম্যানকেও ধীরে ধীরে পাহাড়ে তুলতে হবে, চা কফি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হতো।

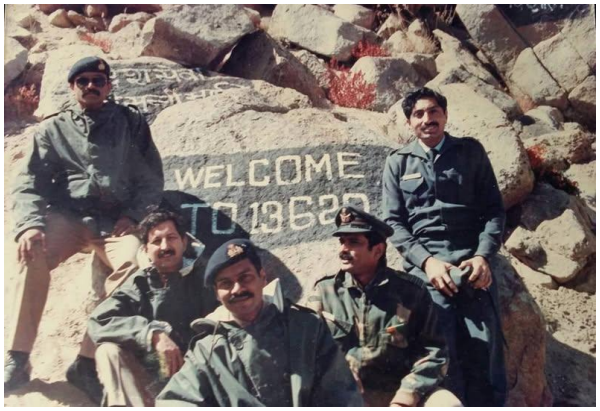

এই ছবিরও একটা গপ্পো আছে –

একবার আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের ৫০ জন অফিসার গেছি পাহাড়ে কোন একটা কোর্স করতে। হঠাৎ কথা উঠল ফিটনেস নিয়ে। সবাই দৌড়ে কত ওপরে উঠতে পারবে। সবাই শীতকালের জামাকাপড় পরে, বেশি নড়াচড়া সুবিধের নয়। সেটা প্রায় একটা স্যুট।

অবশেষে আমরা কয়েকজন এই অবধি উঠে হাঁপ ছাড়লাম। আমাদের থেকেও বড় monkey অবশ্য অন্য গ্রুপে ছিল, যারা ১৫০০০ ফিট পর্যন্ত আরামসে দৌড়ে উঠে গেল। আমরা ওপিস থেকে বেরিয়েই দৌড়ে পাহাড়ে, হাতে রইল পেন্সিল। সাধারণ জুতো যেটাকে Oxford Pattern Shoe (OP Shoe) বলে, সেটা পরে পাহাড়ে দৌড়ে ওঠা খুব কঠিন ছিল।

Sweet Memories

সেনানী

আনন্দিতা চৌধুরী

"কাকিমা, কাকিমা..." জোরে জোরে দরজা ধাক্কাচ্ছে কেউ। রুমা তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ভিতরে আসে পাশের বাড়ির রাজু, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "কাকিমা, বাবু... বাবু..."

বুকটা ধক করে ওঠে রুমার। "কী হয়েছে বাবুর!"

কেঁদে ফেলে রাজু, বলতে পারে না কিছুই।

হাত পা অবশ হয়ে আসে রুমার। বছর কয়েক আগের দিনটা মনে পড়ে তার। এইরকমই ছুটে এসেছিল প্রতিবেশী গণেশদা, এইরকমই দরজা ধাক্কা দিয়ে তাকে ডেকেছিল, তাকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বড় রাস্তায়, যেখানে বাসের চাকার নীচে পড়েছিল তার স্বামী সুভাষ।

ছোট থেকেই মিষ্টি গোলগাল ফর্সা চেহারা রুমার। অতি সাধারণ পরিবারে মেয়েদের বেশি দূর অবধি পড়ানোর কথা ভাবা হয় না এমনিতেই। তাছাড়া তার যে এক দেখাতেই বিয়ে হয়ে যাবে একথা শুনতে শুনতে বড় হওয়া রুমা পড়াশোনা নিয়ে মাথা ঘামায়নি বিশেষ। তা, চটপট তার বিয়েও হয়ে গেল, মাধ্যমিকের পর পরই। স্বামী একটা কারখানায় কাজ করে, দারুণ কিছু আয় নয়, তবে স্থায়ী চাকরি, তাদের জন্য এই অনেক।

খুব গুছিয়ে সংসার করে রুমা। বাবু তাদের কোলে আসে বছর দুই পরে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো, বাবুর দেখভাল, তার স্কুল, সংসারের বিভিন্ন কাজে কেটে যায় রুমার দিনগুলো। এর বাইরে সে পারেও না কিছু, চায়ও না করতে, কোনোদিন দরকারও পড়েনি।

সুভাষ বিছানায় পড়তে দরকার পড়ল বৈকি। বেশ কিছুদিন ডাক্তার হাসপাতাল ছোটাছুটি করে শেষমেশ সুভাষ বাড়ি এল ক্রাচে ভর দিয়ে, খুইয়ে এল তার একটি পা এবং চাকরিটি। সুভাষের কারখানা থেকে তার কিছু প্রাপ্য হয়, কিন্তু সেটা আদায় করতে বারবার ট্যাক্সি করে সুভাষকে নিয়ে ছোটার রেস্ত নেই তাদের। অগত্যা রুমা যাওয়া আসা করে ভিড় বাস ঠেলে। প্রথম প্রথম গণেশদা বা রুমার কোনো আত্মীয় সঙ্গে যেত, কিন্তু কারই বা সময় আছে বারে বারে অন্যের প্রয়োজনে

ছুটে বেড়ানোর | রুমা একাই যেতে শুরু করে, ঘোরে এই টেবিল থেকে ওই টেবিল | প্রথমে যারা খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বৌদি বৌদি করত তারাও কিছুদিন পরে তাকে ঢুকতে দেখলে বিরক্ত হয়, বুঝত রুমা | কিন্তু গায়ে মাখলে তো তার চলবে না, শিখে গেছে সে | আরো কত কী যে শিখে গেছে! কে একটু হেসে কথা বললে খুশি হয়, কে চা খাওয়ানোর নাম করে সুশ্রী রুমাকে সামনে বসিয়ে রাখে ঘন্টার পর ঘন্টা, কে একটু বেশি কাছে ঘেঁষে আসে | সব শিখেছে সে | নিজেকে কী করে সরিয়ে রাখতে হয়, সামলে রাখতে হয়, শিখেছে সেটাও |

অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর আদায় হয় সুভাষের প্রাপ্য | রুমা ঠিক করে এই টাকায় হাত দেওয়া হবে না, এ টাকা তোলা থাকবে বাবুর পড়ার জন্য | কিন্তু, তাহলে সংসার চলবে কী করে! বাড়ি ভাড়া, স্কুলের মাইনে, প্রাইভেট টিউটর, খাইখরচ, সুভাষের ওষুধ! একটা চাকরি যদি পায় রুমা! তবে, তাকে চাকরি দেবে কে! এই প্রথম আফসোস হয় তার, কেন পড়াশোনা করেনি মন দিয়ে! কেন বাবার আশ্রয় থেকে সোজা স্বামীর ছায়ায় চলে এল, নিজের জন্য কেন ভাবেনি কখনো! কেন তাদের ভাবতে শেখানো হয়নি! কেন ফাঁকি দিত স্কুলে! আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে, একটা ক্লাসে কিন্তু সে ফাঁকি দিত না | সেলাইয়ের ক্লাস ছিল তার খুব পছন্দের, তার হাতের কাজ দিদিমণিরা অন্য মেয়েদের ডেকে ডেকে দেখাতেন | পাড়ার অন্য মেয়েরা পরীক্ষার আগে তার কাছে সেলাই তুলতে আসত | তার দিদিদের কনে দেখানোয় তো তার শিল্পকর্মই দিদিদের নামে চালিয়েছে তার মা | আচ্ছা, সেলাই দিয়েই কিছু করা যায় না!

সেই শুরু | পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ চাইতে শুরু করে রুমা | শাড়িতে ফল লাগানো দিয়ে শুরু, তারপর ব্লাউজ | প্রথমে খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি যদিও, আসলে হঠাৎ করে কেউ ভরসা করতে পারে না বোধহয় | খুব কম পারিশ্রমিকে কাজ করতে রাজি হওয়ায় একটু একটু করে কিছু কাজ জুটে যায় | সুভাষ একদিন বলে, "এত খাটনির পরে হাতে তো কিছুই থাকে না, সুতোর খরচ মেটে কিনা সন্দেহ, এভাবে কী চলে!"

তবু রুমা হাল ছাড়ে না, চালিয়ে যায় | সুভাষের ব্যথা সে বোঝে | সামান্য চাকরি করলেও স্ত্রীকে যথাসম্ভব যত্নে রাখত তার স্বামী | অল্প সামর্থ্যের মধ্যেও সুখী গৃহবধূ ছিল রুমা | বাইরের জগতের যুদ্ধ বা অন্নচিন্তা কিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে দিত না তাকে সুভাষ | ভাগ্যের ফেরে এখন স্ত্রীকে ঘরে বাইরে এত পরিশ্রম করতে দেখে অসহায় কষ্টে ভোগে মানুষটা | যতটা পারে হাতে হাতে করেও | ধীরে ধীরে যখন রুমার কাজ পাওয়া বাড়ে, তখন সাহায্য করার জন্য মাপ করে কাপড় কাটা, হিসেব রাখা, প্যাকেটে শাড়ি ব্লাউজ ফ্রক গুছিয়ে দেওয়া... বসে বসে এগুলো করে দেয় সুভাষ | কোনোরকম বায়নাক্কা বা আবদার করে না বাপছেলে কেউই, যেদিন অর্ডার বেশি থাকে সেদিন চুপচাপ সেদ্ধভাত খেয়ে উঠে যায় দুজনে | রুমা ভাবে, এই দুজন পাশে থাকলে তার কোনো কষ্টই কষ্ট বলে মনে হয় না | আর, বেশিদিন তো নয়, বাবুর পাস করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে তারা |

বিছানায় বসে শাড়িতে কাঁথা স্টিচের ফোঁড় তুলছিল রুমা | তার হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠছিল ফুল পাখি নকশা; শাড়ির জমিতে তার মনের মাধুরী মিশিয়ে যেন আঁকা হচ্ছিল রূপকথা | মুগ্ধ চোখে দেখে বাবু, বলে, "তোমার কত গুণ মা!" মনে মনে খুশি হয় রুমা, মুখে বলে, "থাক হয়েছে, আমাকে দেখে সময় নষ্ট না করে পড়তে বোস, কাল পরীক্ষা আছে |"

- "যাচ্ছি মা | কিন্তু বলে রাখলাম, আমি পাস করে চাকরি পেলেই তোমাকে কাজ কমাতে হবে কিন্তু | আমি তখন আর তোমায় এত কষ্ট করতে দেব না!"

প্রাণটা জুড়িয়ে যায় রুমার | মায়ের কষ্ট ছেলে বোঝে, আর কী চাই তার | বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে দুইহাত জোড় করে মাথায় ঠেকায়, "ছেলেটার আশা পূর্ণ করো মা |"

আশা পূরণ হয় | ছুটতে ছুটে বাড়ি ঢোকে বাবু, ছোট হলেও একটা চাকরি পেয়েছে সে | মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে রুমা, তার এতদিনের সাধনা আজ সফল হ'ল, ঈশ্বর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন |

বাবু জোরাজুরি করে, "সেলাই বন্ধ করো মা, চোখ একদম খারাপ হয়ে যাচ্ছে |"

রুমা তবু একেবারে ছেড়ে দেয় না, বলে, "প্রথমে যারা কাজ দিয়েছিল, বিপদের দিনে পাশে ছিল, তাদের কী করে ছাড়ি বল! ওই অল্প কিছু কাজ করব, নতুন আর নেব না |"

অনেকটা আরামে দিন কাটে এখন তার | ক্লান্ত শরীরটা একটু বিশ্রাম পায় | তার থেকেও বড় হ'ল মনের শান্তি, উপযুক্ত

সন্তান পাশে এসে দাঁড়ানোর ভরসা | লোন নিয়ে একটা হুইলচেয়ার কিনেছে বাবু| স্বামীকে তাতে বসিয়ে নিজেই ঠেলে সন্ধ্যাবেলায় কাছের পার্কটাতে গিয়ে বসে রুমা| বাবু কাজ থেকে ওই পথেই ফেরে, তখন একসাথে বাড়ি ঢোকে তিনজনে | "এবার মেয়ে দেখতে শুরু করি..." বলে মাঝে মাঝেই বাবুর পিছনে লাগে রুমা| লাজুক হেসে এড়িয়ে যায় বাবু|
এমনই সুখে দিনগুলো কাটছিল।

আজ রাজুর কথায় এক মুহূর্তে এতগুলো বছর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রুমার, ছায়াছবির মতো চলে যাওয়া দিনগুলো যেন দেখে ফেলে এক পলকে|
- "কী হয়েছে বাবুর? বলছিস না কেন... ও রাজু, বল না!" রাজুকে ধরে ঝাঁকায় রুমা | চোখ ঝাপসা হয়ে আসে | দরজায় দাঁড়ানো আরো কিছু মানুষ... ওই তো... সৌরভ, রঞ্জন, কৌশিক, ওরা সবাই বাবুর অফিসেই কাজ করে|

ক্রাচে ভর দিয়ে উঠে এসেছে সুভাষও | তার প্রশ্নের উত্তরে ছেলেগুলো বলে বাবু নাকি তার কম্পানির সাপ্লাই দেওয়া কাঁচামালের কীসব গরমিল ধরে ফেলেছিল | নিজেই গোপনে খোঁজখবর করছিল, থানায় ডায়েরি করতে যাবে জানতে পেরে তার আগেই গুন্ডা লাগিয়ে তাকে রাস্তায় মধ্যেই...

রুমা সব শুনছে, কিন্তু বুঝছে না কিছুই| তার চোখের সামনে ভাসছে সরকারি হাসপাতালে আয়াদিদির কোলে সদ্যজাত বাবু, প্রথম স্কুল ইউনিফর্ম পরা বাবু, তার হাতেবোনা সোয়েটার পরে ছবি তোলা বাবু, গর্বিত মুখে তার হাতে নিজের প্রথম মাইনে তুলে দেওয়া বাবু| রুমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে|

কেটে গেছে একটা বছর | স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের দুনিয়া, স্তব্ধ হয়ে গেছে তারা দুজন| সুভাষ হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে, শূন্য দৃষ্টিতে টিভির দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ বসে দিন কাটে তার, যদিও দেখছে নাকি শুনছে কিছুই বোঝা যায় না|
কিন্তু রুমা! সে তো বসে থাকতে পারে না, সেই বিলাসিতা যে তার নেই| যতদিন সুভাষ আছে, ততদিন তাকে সংসারটা টেনে যেতেই হবে| স্বামীকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, খাবার বেড়ে দিতে হবে, ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হবে| তার তো এখনও কত কাজ পড়ে আছে | যতই শোক হোক, যতই কান্না আসুক, পোড়া পেটটা খাবার চায় যে! তাই আবার সেলাই মেশিন নিয়ে বসে রুমা | আবার ব্যাগ কাঁধে পথে বেরোয় | আবার 'আজ জুটেছে কাল কী হবে'র চিন্তা মাথায় ঘোরে তার|
রুমার যুদ্ধ তো শেষ হয়নি| রুমাদের যুদ্ধ যে শেষ হয় না!

"আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব|
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো –
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে ||"

একটি সাদা বক

‘A White Heron’ by Sarah Orne Jewett

অনুবাদ: নূপুর রায়চৌধুরী

জুন মাসের এক সন্ধ্যা, ঠিক আটটা বাজার আগেই বনভূমি অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল, যদিও গাছের গুঁড়িগুলোর ফাঁকে উজ্জ্বল সূর্যাস্তের ক্ষীণ আভা তখনও মিটমিট করছিল | একটি ছোট মেয়ে তার গরুটিকে তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল | গরুটি স্বভাবগতভাবে ধীরগতি, অলস এবং বিরক্তিকর হলেও, সব মিলিয়ে সে ছিল মেয়েটির মূল্যবান সঙ্গী | তারা পশ্চিমের আলো থেকে দূরে সরে গিয়ে গভীর অন্ধকার জঙ্গলের ভেতরে প্রবেশ করছিল, কিন্তু পথটির সাথে তাদের পায়ের পরিচয় আছে, তাই তাদের চোখ পথটি দেখতে পাচ্ছে কিনা তাতে কিছু যায় আসেনি| গ্রীষ্মকাল জুড়ে এমন কোনো রাত খুব কমই যেত যখন বুড়ি গরুটিকে চারণভূমির বেড়ার কাছে অপেক্ষা করতে দেখা যেত; বরং লম্বা হাকলবেরি ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখাই ছিল তার সবচেয়ে বড় আনন্দ | তার গলায় একটি জোরালো ঘন্টা বাঁধা ছিল, কিন্তু সে আবিষ্কার করেছিল কেউ যদি একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে ঘন্টাটি আর বাজে না | তাই তাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সিলভিয়াকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হতো এবং ‘কো কো’ বলে ডাকতে হতো; কোনো উত্তর আসত না, যতক্ষণ না তার বালিকাসুলভ ধৈর্য পুরোপুরি ফুরিয়ে যেত | যদি প্রাণীটি ভাল এবং প্রচুর দুধ না দিত, তবে তার মালিকদের কাছে বিষয়টি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হতো | তাছাড়া, সিলভিয়ার হাতে অফুরন্ত সময় ছিল, কিন্তু তা কাজে লাগানোর মতো সুযোগ ছিল খুব কম | মাঝে মাঝে সুন্দর আবহাওয়ার দিনে গরুর দুষ্টুমিগুলোকে লুকোচুরি খেলার একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টা হিসেবে দেখলে কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া যেত | যেহেতু মেয়েটির কোনো খেলার সাথী ছিল না, তাই সে বেশ আগ্রহের সাথেই এই খেলাটিতে মেতে উঠত | এই তাড়া করাটা এতটাই দীর্ঘ হয়েছিল যে, সতর্ক প্রাণীটি নিজেই তার অবস্থানের একটি অস্বাভাবিক সংকেত দিয়েছিল | সিলভিয়া যখন জলাভূমির ধারে এসে মিসেস মুলির দেখা পেল, সে কেবল

একটু হাসল এবং বার্চ পাতার একটি ডাল দিয়ে বাড়ির দিকে তাকে আদর করে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল |

বুড়ি গরুটিও আর দূরে ঘুরে বেড়াতে আগ্রহী ছিল না, চারণভূমি ছাড়ার সময় সে প্রথমবারের মতো সঠিক দিকেই মুখ ফেরাল এবং বেশ দ্রুত গতিতে রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল | সে এখন দুধ দেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এবং ঘাস খাওয়ার জন্য সে খুব কমই থামছিল | সিলভিয়া ভাবছিল এতটা দেরি হওয়ার জন্য তার দিদা না জানি কী বলবেন | সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেছে, কিন্তু এই কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যে কতটা কঠিন, তা সবাই জানত | মিসেস টিলি নিজেও গ্রীষ্মের অনেক সন্ধ্যায় ওই শিংওয়ালা উৎপাতটার পেছনে ছুটেছেন, তাই দেরি করার জন্য তিনি অন্য কাউকে দোষ দিতে পারতেন না বরং অপেক্ষা করার সময় শুধু এই ভেবেই কৃতজ্ঞ থাকতেন যে আজকাল সিলভিয়াকে তিনি এমন মূল্যবান সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছেন | তবে ভাল মানুষটি সন্দেহ করতেন যে সিলভিয়া মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছাতেই ঘোরাঘুরি করে; বাড়ির বাইরে এভাবে ঘুরে বেড়ানোর মতো এমন আরেকটি বাচ্চা দুনিয়াতে কখনোই জন্মায়নি!

সবাই বলেছিল যে, একটি জনাকীর্ণ শিল্প শহরে আট বছর ধরে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করা একটি ছোট মেয়ের জন্য এটি একটি ভাল পরিবর্তন | কিন্তু সিলভিয়ার নিজের কাছে মনে হতো খামারে এসে থাকার আগে সে যেন জীবিতই ছিল না | সে প্রায়ই করুণাভরা বিষণ্ন মন নিয়ে শহরের এক প্রতিবেশীর একটি হতভাগ্য শুকনো জেরানিয়াম গাছের কথা ভাবত |

বুড়ি মিসেস টিলি নিজের মেয়ের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ভিড় থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে সিলভিয়াকে বেছে নিয়ে খামারের দিকে ফেরার পথে মুচকি হেসে মনে মনে বললেন, ‘মানুষকে ভয় পায়! ওরা বলেছিল! আমার মনে হয়, পুরনো বাড়িটাতে গেলে ওদের নিয়ে ওকে আর খুব একটা সমস্যায় পড়তে হবে না!’

যখন তারা নির্জন বাড়িটার দরজার কাছে পৌঁছে তালা খোলার জন্য থামল বিড়ালটা এসে জোরে জোরে গরগর শব্দ করতে লাগল আর তাদের গায়ে গা ঘষতে লাগল | সত্যিই এক পরিত্যক্ত বিড়াল, তবে ছোট রবিন পাখিটা খেয়েদেয়ে বেশ মোটাসোটা হয়েছে | তখন সিলভিয়া ফিসফিস করে বলল যে,

থাকার জন্য কী সুন্দর একটা জায়গা এটা, সে আর কখনই বাড়ি ফিরে যেতে চাইবে না।

সঙ্গী দুজন ছায়াময় বনপথ ধরে এগিয়ে চলল, গরুটি ধীর পায়ে এবং মেয়েটি খুব দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। গরুটি ঝর্ণার ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে জল পান করল, যেন চারণভূমিটির অর্ধেক জলাভূমি ছিল না। সিলভিয়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, তার খালি পাদুটিকে অগভীর জলে ঠান্ডা হতে দিল। গোধূলির বড় বড় মথগুলো আলতো করে তার গায়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। গরুটি সরে গেলে সে ঝর্ণার জল ভেঙে এগিয়ে চলল এবং আনন্দে দ্রুত স্পন্দিত হৃদয়ে থ্রাশ পাখির গান শুনতে লাগল। মাথার উপরের বড় বড় ডালপালাগুলোতে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। সেগুলো ছোট ছোট পাখি আর পশুতে ভরা ছিল, যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা পুরোপুরি জেগে আছে এবং নিজেদের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা ঘুম জড়ানো কিচিরমিচির করে একে অপরকে শুভরাত্রি জানাচ্ছে। সিলভিয়া নিজেও হাঁটতে হাঁটতে ঘুম ঘুম অনুভব করছিল। তবে বাড়ি আর বেশি দূরে নয় আর বাতাসও কেমন নরম ও মিষ্টি। সে সাধারণত এত রাত পর্যন্ত জঙ্গলে কখনো থাকেনি। এই পরিবেশ তাকে এমন অনুভূতি দিচ্ছিল যেন সে ধূসর ছায়া আর নড়তে থাকা পাতাগুলোরই এক অংশবিশেষ।

সে ভাবছিল, এক বছর আগে খামারে আসার পর থেকে যেন কত দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে, আর ভাবছিল যে কোলাহলপূর্ণ শহরটিতে সবকিছু ঠিক তেমনই চলছে কিনা যেমনটা সে সেখানে থাকাকালীন চলত। এমন সময় সেই বিশাল লালমুখো ছেলেটির কথা মনে পড়ল যে তাকে তাড়া করত এবং ভয় দেখাত; এটা ভাবামাত্রই সে গাছের ছায়া থেকে বাঁচার জন্য পথ ধরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

হঠাৎ খুব কাছ থেকে একটি স্পষ্ট শিস শুনে ছোট্ট বনবালিকাটি ভয়ে শিউরে উঠল। পাখির শিস নয়, যাতে এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব থাকে, বরং একটি পুরুষ মানুষের শিস, দৃঢ় এবং কিছুটা আক্রমণাত্মক। সিলভিয়া গরুটিকে করুণ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সতর্কতার সাথে ঝোপের আড়ালে সরে গেল, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। শত্রু তাকে দেখে ফেলেছে এবং খুব হাসিখুশি ও মিষ্টি স্বরে তাকে ডেকে সে বলল, "ও ছোট্ট মেয়ে, রাস্তাটা এখান থেকে আর কত দূরে?" কাঁপতে কাঁপতে সিলভিয়া প্রায় অস্ফুটে উত্তর দিল, "অনেকটা পথ।" সে কাঁধে বন্দুক বহনকারী লম্বা যুবকটির দিকে সাহস করে তাকাতে পারল না, কিন্তু ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে আবার তার গরুটির পিছু নিল, আর লোকটিও তার পাশে পাশেই হাঁটতে লাগল।

- "আমি পাখি শিকার করছিলাম।" অপরিচিত লোকটি দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, "এবং আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার একজন বন্ধুর খুব প্রয়োজন। ভয় পেয়ো না।" সে বীরত্বের সাথে যোগ করল। "কথা বলো এবং আমাকে তোমার নাম বলো। তুমি কি মনে করো যে আমি তোমাদের বাড়িতে আজ রাতটা কাটাতে পারব এবং কাল খুব সকালে বন্দুক নিয়ে শিকারে বের হতে পারব?"

সিলভিয়া আগের চেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। তার দিদা কি এর জন্য তাকেই দায়ী করবেন না? কিন্তু এমন একটি দুর্ঘটনার কথা কে-ই বা আগে থেকে অনুমান করতে পারত? এটা তার দোষ বলে তার মোটেই মনে হ'ল না, আর সে এমনভাবে মাথা নিচু করল যেন তার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, কিন্তু তার সঙ্গী যখন আবার তার নাম জিজ্ঞাসা করল, তখন অনেক কষ্টে সে উত্তর দিল, 'সিলভি'।

এই তিনমূর্তি যখন দৃষ্টিগোচরে এল, মিসেস টিলি তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। গরুটি যেন কৈফিয়ত স্বরূপ একটি জোরালো হাম্বা ডাক দিল।

- "হ্যাঁ, তুমিই বরং নিজের হয়ে কথা বলো, বুড়ি আপদ কোথাকার! এবার আবার সে কোথায় লুকিয়ে ছিল, সিলভি?" সিলভি সম্ভ্রমমিশ্রিত নীরবতা পালন করল; সে সহজাতভাবে বুঝতে পারছিল যে তার দিদা পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। তিনি নিশ্চয়ই অপরিচিত লোকটিকে এই অঞ্চলের কোনো চাষির ছেলে বলে ভুল করছেন।

যুবকটি তার বন্দুক দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখল, ভারী শিকারের ব্যাগটাও তার পাশেই নামিয়ে রাখল; তারপর সে মিসেস টিলিকে শুভ সন্ধ্যা জানাল এবং তার পথ ভ্রমণের গল্পটা আবারও বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল যে সে এক রাতের জন্য সেখানে আশ্রয় পেতে পারে কিনা।

- "আপনার যেখানে খুশি আমাকে থাকতে দেবেন। সকালে দিনের আলো ফোটার আগেই আমাকে চলে যেতে হবে; কিন্তু

আমার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে। অন্ততপক্ষে আপনি আমাকে কিছুটা দুধ দিতেই পারেন, এটা তো স্পষ্ট।" যুবকটি বলল
- "হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।" গৃহকর্ত্রী উত্তর দিলেন, যাঁর দীর্ঘদিনের সুপ্ত আতিথেয়তা সহজেই জেগে উঠেছে বলে মনে হচ্ছিল। "আপনি যদি মাইলখানেক দূরে প্রধান সড়কে যান, তবে হয়তো আরও ভাল ব্যবস্থা পাবেন, তবে আমাদের যা আছে তাতেই আপনাকে স্বাগত। আমি এক্ষুনি দুধ দুইব, আর আপনি এটা নিজের বাড়ির মতোই মনে করুন। আপনি তুষের ওপর বা পালকের ওপর ঘুমাতে পারেন।" তিনি সানন্দে জানালেন। "আমিই ওদের সবাইকে বড় করেছি। এখান থেকে একটু নিচে জলাভূমির দিকে হাঁসদের জন্য ভাল চারণভূমি আছে। যাও তো সিলভি, ভদ্রলোকের জন্য একটা থালা সাজিয়ে দাও।"
সিলভি তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গেল। কিছু একটা করার সুযোগ পেয়ে সে খুশি হয়, তার নিজেরও খুব খিদে পেয়েছিল।

নিউ ইংল্যান্ডের এই জনমানবহীন প্রান্তরে এত পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক এরকম একটি ছোট বাসস্থান খুঁজে পাওয়াটা ছিল এক বিস্ময়। যুবকটি এখানকার অত্যন্ত আদিম গৃহস্থালির বিভীষিকা এবং সমাজের সেই স্তরের বিষণ্ন নোংরামি সম্পর্কে জানত, যেখানে মুরগিদের সাহচর্য নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। একটা পুরনো ধাঁচের খামারবাড়ির সেরা মিতব্যয়িতা রয়েছে এখানে, যদিও তা এত ছোট পরিসরে যে এটা একটা আশ্রমের মতো মনে হচ্ছিল। অতিথিটি আগ্রহভরে বৃদ্ধা মহিলার অদ্ভুত কথা শুনছিল, ক্রমবর্ধমান উৎসাহ নিয়ে সিলভিয়ার ফ্যাকাশে মুখ আর উজ্জ্বল ধূসর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল যে, এটিই গত এক মাসে তার সেরা রাতের খাবার। তারপর চাঁদ ওঠার পর নতুন তৈরি হওয়া বন্ধুরা দরজার সামনে একসঙ্গে এসে বসল।

শীঘ্রই বেরি তোলার সময় এসে যাবে, আর সিলভিয়া এই কাজে খুব সাহায্য করে। গরুটি ভাল দুধ দেয়, যদিও তাকে নজরে রাখাটা বেশ ঝামেলার কাজ, গৃহকর্ত্রী অকপটে গল্প করতে করতে বললেন। এরপর যোগ করলেন যে তিনি চারটি সন্তানকে কবর দিয়েছেন, সিলভিয়ার মা এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকা এক ছেলে (যে হয়তো ইতিমধ্যে মারাই গেছে) ছাড়া তাঁর আর কোনো সন্তান বেঁচে নেই। "আমার ছেলে, ড্যান শিকার করতে খুব পারদর্শী ছিল।" তিনি দুঃখের সাথে ব্যাখ্যা করলেন। "সে বাড়িতে থাকাকালীন আমি কখনো তিতির পাখি বা ধূসর কাঠবিড়ালির অভাব বোধ করিনি। আমার মনে হয়, সে একজন মস্ত ভবঘুরে হয়ে গেছে, আর সে চিঠি লিখতে একদমই পছন্দ করে না। তবে, আমি তাকে দোষ দিই না, আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমিও পৃথিবীটা ঘুরে দেখতাম।"

এক মিনিটের বিরতির পর দিদা স্নেহভরে বলতে লাগলেন, "সিলভিয়া ঠিক ওর মতোই হয়েছে। এখানে এমন এক ইঞ্চি কোনো জমি নেই যেখানকার পথঘাট সে চেনে না, আর বন্য প্রাণীরাও তাকে নিজেদের একজন বলেই মনে করে। সে কাঠবিড়ালিদের এমনভাবে পোষ মানিয়েছে যে তারা এসে তার হাত থেকে খাবার খায়, আর আসে সব ধরনের পাখিরাও। গত শীতে সে জে-বার্ডদের এখানে আসতে শিখিয়েছিল, আর আমি বিশ্বাস করি, আমি যদি খেয়াল না রাখতাম, তাহলে সে ওদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট খাবার রাখতে গিয়ে নিজের খাবারই কম খেত। আমি তাকে বলি, কাক ছাড়া অন্য যে কোনো প্রাণীকে সাহায্য করতে আমি রাজি আছি, যদিও ড্যান একটা কাককে পোষ মানিয়েছিল, যেটাকে দেখে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান বলে মনে হতো। সে চলে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত এই ঘটনাটা নিয়ে এখানে আলোচনা হতো। ড্যান আর তার বাবার মধ্যে বনিবনা হতো না কিন্তু ড্যান তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে চলে যাওয়ার পর থেকে তিনি আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি।"
অন্য কোনো একটা বিষয়ে গভীর আগ্রহের কারণে অতিথিটি কিন্তু পারিবারিক দুঃখের এই ইঙ্গিত লক্ষ্যই করল না।
- "তাহলে সিলভি পাখিদের সম্পর্কে সবকিছু জানে, তাই না?" বিস্ময়ের সাথে বলে উঠে সে সেই মেয়েটির দিকে তাকাল যে চাঁদের আলোয় খুব শান্তশিষ্টভাবে ঘুম ঘুম চোখে বসে ছিল।
- "আমি নিজেও পাখিদের একটি সংগ্রহ তৈরি করছি। ছেলেবেলা থেকেই আমি এই কাজটি করছি।"
(মিসেস টিলি হাসলেন)।
- "এমন দু'তিনটি অত্যন্ত দুর্লভ পাখি আছে, যেগুলো আমি গত পাঁচ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়, তবে আমি আমার নিজের এলাকাতেই সেগুলোকে ধরতে চাই।"
এই উৎসাহপূর্ণ ঘোষণার জবাবে মিসেস টিলি সন্দিগ্ধ হয়ে

জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সেগুলোকে খাঁচায় পুরে রাখো?" পক্ষীবিজ্ঞানী বলল, "ওহ না, সেগুলোকে স্টাফ করে সংরক্ষণ করা হয়, ডজন ডজন পাখি। আর আমি প্রতিটি পাখি নিজেই গুলি করে বা ফাঁদ পেতে ধরেছি। শনিবার এখান থেকে তিন মাইল দূরে আমি একটি সাদা পাখি দেখতে পেয়েছিলাম এবং আমি সেটিকে অনুসরণ করেই এইদিকে এসেছি। এই জেলায় এই পাখি আগে কখনো দেখা যায়নি। ওটা একটা ছোট সাদা বক।" এই বলে সে আবার সিলভিয়ার দিকে তাকাল, এই আশায় যে হয়তো সে জানতে পারে যে এই বিরল পাখিটি তার পরিচিতদের মধ্যে একটি। কিন্তু সিলভিয়া তখন সংকীর্ণ পায়ে-হাঁটা পথের উপর একটা থপথপে ব্যাঙের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

- "তুমি বকটাকে দেখলেই চিনতে পারবে।" অপরিচিত লোকটি আগ্রহভরে বলতে লাগল। "একটা অদ্ভুত লম্বা সাদা পাখি, নরম পালক আর লম্বা সরু সরু পা। সম্ভবত একটা উঁচু গাছের মগডালে সেটার বাসা রয়েছে, যা ডালপালা দিয়ে তৈরি, অনেকটা বাজপাখির বাসার মতো।"

সিলভিয়ার হৃদস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল; সে সেই অদ্ভুত সাদা পাখিটিকে চেনে। একবার সে চুপিচুপি তার কাছে গিয়েছিল, যখন পাখিটি বনের অন্য পাশে উজ্জ্বল সবুজ জলাভূমির ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে একটা খোলা জায়গা ছিল যেখানে সূর্যের আলো সবসময় অদ্ভুতভাবে হলুদ এবং গরম লাগে, যেখানে লম্বা, নুয়ে পড়া নলখাগড়ারা জন্মায়। তার দিদা তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সেখানকার নরম কালো কাদায় সে ডুবে যেতে পারে এবং তখন তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাবে না। সামান্য দূরেই ছিল লবণাক্ত জলাভূমি এবং তার ওপারে ছিল সমুদ্র, যে সমুদ্র নিয়ে সিলভিয়া বিস্ময় প্রকাশ করত এবং স্বপ্ন দেখত, কিন্তু কখনো তা দেখেনি, যদিও ঝড়ের রাতে বনের শব্দের মধ্যেও তার বিশাল গর্জন প্রায়ই শোনা যেত।

- "আমি এমন কিছু ভাবতে পারছি না, যা ওই বকের বাসা খুঁজে পাওয়ার চেয়ে বেশি পছন্দ করব।" অপরিচিত সুদর্শন লোকটি বলল, "কেউ আমাকে সেটা দেখিয়ে দিতে পারলে আমি তাকে দশ ডলার দেব।" সে মরিয়া হয়ে যোগ করল, "এবং প্রয়োজন হলে আমি আমার পুরো ছুটিটা এই খোঁজার পেছনে ব্যয় করব। হয়তো এটা কেবলমাত্র একটা পরিযায়ী পাখি, অথবা অন্য কোনো শিকারী পাখির তাড়া খেয়ে নিজ এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে।"

মিসেস টিলি এসব কথা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে শুনছিলেন। কিন্তু সিলভিয়া তখনও ব্যাঙটার দিকেই তাকিয়ে ছিল। সে বুঝতে পারছিল না; কোনো শান্ত সময়ে হয়তো বুঝতে পারত যে প্রাণীটি দরজার ধাপের নিচের গর্তে যেতে চাইছে এবং সন্ধ্যার এই সময়ে অস্বাভাবিক দর্শকদের উপস্থিতির কারণে তা বেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেই রাতে অনেক ভেবেও ঠিক করা গেল না যে, এত সহজে বলে দেওয়া দশ ডলার দিয়ে কতগুলো কাঙ্ক্ষিত জিনিস কেনা যাবে।

পরদিন যুবক শিকারীটি জঙ্গলের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। সিলভিয়া তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। লোকটি অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল প্রমাণিত হওয়ায় তার প্রতি সিলভিয়ার আগের ভয়টা কেটে গিয়েছিল। সে তাকে পাখি সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিল – তারা কী জানে, কোথায় থাকে এবং তারা নিজেদের নিয়ে কী করে। আর সে সিলভিয়াকে একটা পকেট ছুরি উপহার দিয়েছিল, যা সিলভিয়ার কাছে এতটাই মূল্যবান মনে হয়েছিল যেন সে কোনো নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। সারাদিন ধরে লোকটি একবারও সিলভিয়াকে বিরক্ত বা ভীত করেনি, কেবল যখন সে কোনো অসতর্ক গান গাওয়া পাখিকে তার গাছের ডাল থেকে গুলি করে নামাত, তখন ছাড়া। সিলভিয়া তাকে আরও অনেক বেশি পছন্দ করত যদি তার হাতে কোনো বন্দুক না থাকত; সে বুঝতে পারছিল না কেন লোকটি সেই পাখিগুলোকেই হত্যা করে যাদের সে নিজে এত পছন্দ করে বলে।

দিন গড়িয়ে আসার সাথে সিলভিয়া তখনও সেই যুবকটিকে মুগ্ধ ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখছিল। সে এর আগে এত সুদর্শন ও মনোমুগ্ধকর কাউকে দেখেনি। তার বালিকাসুলভ হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত নারীসত্তাটি ভালবাসার এক স্বপ্নে অস্পষ্টভাবে শিহরিত হচ্ছিল। সেই মহান শক্তির কোনো পূর্বাভাস এই তরুণ বনচারীদের আলোড়িত করছিল, যারা নিঃশব্দে সতর্ক পায়ে গভীর বনাঞ্চলের মধ্যে পথ চলছিল। তারা ডালপালা সরিয়ে পথ করে নিচ্ছিল, একে অপরের সাথে কদাচিৎ এবং ফিসফিস করে কথা বলছিল; যুবকটি আগে আগে যাচ্ছিল, সিলভিয়া মুগ্ধ হয়ে কয়েক পা পেছনে তাকে অনুসরণ করছিল,

তার ধূসর চোখদুটি উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

সে শোকে কাতর ছিল কারণ বহু আকাঙ্ক্ষিত সাদা বকটি অধরাই রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে অতিথিকে পথ দেখায়নি, শুধু অনুসরণ করেছিল, আগে থেকে কোনো কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। তার নিজেরই প্রশ্নাতীত কণ্ঠস্বর তাকে ভীত করে তুলছিল, প্রয়োজন হলে হ্যাঁ বা না উত্তর দেওয়াই তার জন্য যথেষ্ট কঠিন ছিল। অবশেষে সন্ধ্যা নেমে এল এবং তারা গরুটিকে নিয়ে একসাথে বাড়ির দিকে চলল। আর যখন তারা সেই জায়গাটাতে পৌঁছাল, যেখানে আগের রাতে সে শিসের আওয়াজ শুনে ভয় পেয়েছিল, এখন সিলভিয়া আনন্দে হেসে উঠল।

*****

বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে, বনের শেষপ্রান্তে, যেখানে জমি সবচেয়ে উঁচু, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বিশাল পাইন গাছ, তার প্রজন্মের শেষ গাছ। এটাকে সীমানা চিহ্ন হিসেবে রাখা হয়েছে, নাকি অন্য কোনো কারণে, তা কেউ বলতে পারে না। যে কাঠুরেরা এর সঙ্গী গাছগুলো কেটেছিল, তারা অনেক আগেই মারা গিয়েছে, এবং পাইন, ওক ও মেপলের মতো শক্তপোক্ত গাছের একটা নতুন বন আবার বেড়ে উঠেছে। কিন্তু এই পুরনো পাইন গাছটার রাজকীয় চূড়াটা তাদের সবার উপরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ও বহু মাইল দূর থেকে সমুদ্র তীরের জন্য একটি নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সিলভিয়া গাছটাকে খুব ভালভাবে চেনে। সে সবসময় বিশ্বাস করত, যে কেউ এর চূড়ায় উঠতে পারলে সমুদ্র দেখতে পাবে; এবং মেয়েটি প্রায়ই সেই এবড়োখেবড়ো বিশাল কান্ডটার উপর হাত রাখত। সজল চোখে সেই অন্ধকার, ঘন ডালগুলোর দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত, যেগুলোকে ঠান্ডা বাতাস সবসময়ই নাড়িয়ে দিত, সে নিচের বাতাস যতই গরম আর স্থির থাকুক না কেন।

এবার সে এক নতুন উত্তেজনার সাথে গাছটার কথা ভাবল। কারণ, যদি কেউ ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথে সেটাতে চড়ে, তবে সে কি পুরো পৃথিবী দেখতে পাবে না, সাদা বকটি কোথা থেকে উড়ে আসে তা সহজেই আবিষ্কার করতে পারবে না, আর জায়গাটি চিহ্নিত করে লুকানো বাসাটি খুঁজে বের করতে পারবে না! কী দুঃসাহসিক স্পৃহা, কী উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা! পরবর্তী সকালে যখন সে এই গোপন রহস্যটি প্রকাশ করতে পারবে, তখন সেটা হবে এক কল্পিত বিজয়, আনন্দ এবং গৌরবের অনুভূতি! সেটা এতটাই বাস্তব এবং এতটাই মহৎ ছিল যে, একটি শিশুসুলভ হৃদয়ের পক্ষে তা সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছিল।

সারারাত ছোট বাড়িটার দরজা খোলা ছিল, আর হুইপুরউইল পাখিরা এসে ঠিক দরজার ধাপের উপর বসে গান গাইছিল। তরুণ শিকারী এবং তার বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, কিন্তু সিলভিয়ার মহৎ পরিকল্পনা তাকে পুরোপুরি জাগিয়ে রেখেছিল এবং সে জেগে থেকে নজর রাখছিল। সে ঘুমের কথা ভাবতেই ভুলে গিয়েছিল। গ্রীষ্মের ছোট রাতটা শীতের অন্ধকারের মতোই দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। অবশেষে যখন হুইপুরউইল পাখিদের ডাক থেমে গেল, তার ভয় হতে লাগল সকালটা হয়তো শেষ পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়িই এসে যাবে। সে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এবং বনের মধ্যে দিয়ে চারণভূমির পথ ধরে এগিয়ে চলল। সামনের খোলা জায়গার দিকে দ্রুত পা বাড়াল, আর পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তার স্পর্শে নড়ে ওঠা ডালে একটা আধ-জাগা পাখির তন্দ্রাচ্ছন্ন কিচিরমিচির শব্দে এক ধরনের স্বস্তি ও সাহচর্য অনুভব করতে লাগল। হায়, যদি মানুষের প্রতি আগ্রহের সেই বিশাল ঢেউ, যা প্রথমবারের মতো তার এই নিস্তেজ ছোট জীবনে প্লাবন এনেছিল, প্রকৃতির সাথে একাত্ম জীবন এবং বনের নীরব জীবনের সন্তুষ্টিগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

সেখানে ফ্যাকাশে চাঁদের আলোয় বিশাল গাছটা তখনও ঘুমিয়ে ছিল, আর ছোট্ট ও আশাবাদী সিলভিয়া অসীম সাহসে তার মাথায় চড়ার জন্য, উপরে উঠতে শুরু করল। তার সারা শরীরে রক্তনালীর পথে শিহরণ জাগানো, টগবগিয়ে ফুটন্ত রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, খালি পা ও আঙুলগুলো পাখির নখের মতো আঁকড়ে ধরেছিল সেই বিশাল গুঁড়িটাকে, যা উপরে, আরও উপরে, প্রায় আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে।

প্রথমে তাকে পাশে জন্মানো সাদা ওক গাছটাতে উঠতে হবে, যেখানে অন্ধকার ডালপালা আর শিশিরভেজা ভারী সবুজ পাতার ভিড়ে সে প্রায় হারিয়েই গেল। একটা পাখি তার বাসা থেকে উড়ে গেল, একটা লাল কাঠবিড়ালি এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল আর এই নিরীহ অনুপ্রবেশকারীকে দেখে

বিরক্ত হয়ে কিচিরমিচির করতে লাগল।

সিলভিয়া সহজেই পথ খুঁজে নিল। সে প্রায়ই সেখানে চড়ত, জানত যে ওক গাছের আরও কিছুটা উপরে একটি ডাল পাইন গাছের কান্ডের সাথে ঘষা খাচ্ছে, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে পাইন গাছটির নিচের ডালগুলো ঘন হয়ে আছে। যখন সে এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিপজ্জনকভাবে পার হবে, তখনই আসল দুঃসাহসিক অভিযানটি শুরু হবে।

অবশেষে সে দোদুল্যমান ওক গাছের ডাল বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল এবং সাহসের সাথে পুরনো পাইন গাছটিতে পা রাখল। পথটা তার ধারণার চেয়েও কঠিন ছিল। তাকে অনেক দূর পর্যন্ত হাত বাড়াতে হচ্ছিল এবং শক্ত করে ধরে থাকতে হচ্ছিল। ধারালো শুকনো ডালপালাগুলো তাকে রাগী নখের মতো আঁকড়ে ধরছিল ও আঁচড়ে দিচ্ছিল। গাছের বিশাল কান্ডটি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠার সময় গাছের আঠা তার সরু ছোট আঙুলগুলোকে শক্ত করে তুলছিল। নিচের জঙ্গলে চড়ুই আর রবিন পাখিরা ভোরের আলোয় জেগে উঠে কিচিরমিচির শুরু করেছে। পাইন গাছটির উপরে জায়গাটা অনেক বেশি আলোকিত মনে হচ্ছে। মেয়েটি বুঝতে পারছিল যে তার পরিকল্পনা সফল করতে হলে তাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

মেয়েটি যত উপরে উঠছিল, গাছটা যেন তত উপরের দিকে আরও প্রসারিত হচ্ছিল। এটি ছিল যেন ভ্রমণরত পৃথিবীর এক বিশাল মাস্তুল; সেই সকালে তার বিশাল দেহজুড়ে নিশ্চয়ই এক বিস্ময়ের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল, যখন সে অনুভব করছিল মানব আত্মার এই দৃঢ় স্ফুলিঙ্গটি এক ডাল থেকে অন্য ডালে হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে। কে জানে, সেই হালকা, দুর্বল প্রাণীটিকে তার যাত্রাপথে সুবিধা দেওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতম ডালপালাগুলোও কত স্থিরভাবে নিজেদের ধরে রেখেছিল!

পুরনো পাইন গাছটা নিশ্চয়ই তার এই নতুন আশ্রয়-প্রার্থীকে ভালবেসে ফেলেছিল। তাই সমস্ত বাজপাখি, বাদুড়, মথ এমনকি সুকণ্ঠী থ্রাশ পাখিদের চেয়েও তার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছিল সেই ধূসর চোখের মেয়েটির সাহসী, স্পন্দনশীল হৃদয়টি। আর ওই জুন মাসের সকালে গাছটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, যখন পূর্ব আকাশে ভোরের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।

শেষ কাঁটাওয়ালা ডালটা পার হওয়ার পর যখন ক্লান্ত সিলভিয়া গাছের মগডালে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, কিন্তু পুরোপুরি বিজয়ী – তখন নিচ থেকে দেখলে তার মুখটা একটা ফ্যাকাশে তারার মতো লাগছিল।

হ্যাঁ, সেখানেই ছিল সমুদ্র, যার উপর উদীয়মান সূর্য সোনালি ঝলক ছড়াচ্ছিল। সেই গৌরবময় পূর্বদিকে দুটি বাজপাখি ধীর গতিতে ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছিল। এত উঁচু থেকে পাখিগুলোকে কত কাছে দেখাচ্ছিল, অথচ নিচ থেকে নীল আকাশের পটভূমিতে তাদের কালো বিন্দুর মতো দেখায়। তাদের ধূসর পালকগুলো মথের ডানার মতোই নরম ছিল; মনে হচ্ছিল যেন তারা গাছটা থেকে খুব বেশি দূরে নেই, আর সিলভিয়ার মনে হচ্ছিল সে নিজেও হয়তো মেঘের মধ্যে উড়ে যেতে পারবে। পশ্চিমদিকে বনভূমি আর ক্ষেতগুলো মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ছিল; এখানে-সেখানে গির্জার চূড়া আর সাদা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল; সত্যিই এ এক বিশাল ও বিস্ময়কর জগৎ। পাখিরা আরো জোরে গান গাইছিল। অবশেষে বিভ্রান্তিকর উজ্জ্বলতা নিয়ে সূর্য উদিত হ'ল। সিলভিয়া সমুদ্রের বুকে জাহাজের সাদা পাল দেখতে পাচ্ছিল, এবং যে মেঘগুলো প্রথমে বেগুনি, গোলাপী ও হলুদ রঙের ছিল, সেগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। সবুজ শাখাপ্রশাখার সমুদ্রে সাদা বকের বাসাটা ঠিক কোথায় রয়েছে! এমন এক মাথা-ঘোরানো উচ্চতায় ওঠার পুরস্কার হিসেবে কি জগতের এই চমৎকার দৃশ্য আর শোভাযাত্রাই একমাত্র প্রাপ্তি?

এবার আবার নিচের দিকে তাকাও সিলভিয়া, যেখানে উজ্জ্বল বার্চ আর ঘন হেমলক গাছের মাঝে সবুজ জলাভূমিটি অবস্থিত; যেখানে তুমি একবার সাদা বকটাকে দেখেছিলে, সেখানেই তাকে আবার দেখতে পাবে, দেখো, দেখো! তার একটি সাদা বিন্দু, যেন একটি ভাসমান পালক, মরা হেমলক গাছটার পাশ থেকে উপরে উঠে আসছে এবং বড় হচ্ছে, আবার উপরে উঠছে, এবং অবশেষে কাছে চলে আসছে স্থির ডানার ঝাপটায়, প্রসারিত সরু গলা ও ঝুঁটিওয়ালা মাথা নিয়ে সেই নির্দিষ্ট পাইন গাছটার পাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। অপেক্ষা করো! অপেক্ষা করো! এক পা বা এক আঙুলও নড়িও না, ছোট্ট মেয়ে তোমার দুই উৎসুক চোখ থেকে আলো আর সচেতনতার

কোনো তীর ছুঁড়ো না, কারণ বকটা তোমার থেকে খুব বেশি দূরে নয় এমন একটি পাইন গাছের ডালে বসেছে। বাসায় থাকা তার সঙ্গিনীকে ডেকে সাড়া দিচ্ছে, আর নতুন দিনের জন্য তার পালকগুলো পরিপাটি করছে!

এক মিনিট পরেই যখন একদল কিচিরমিচির করা ক্যাটবার্ড গাছটাতে এসে জড়ো হয়, তখন মেয়েটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এবং তাদের ওড়াউড়ি ও বিশৃঙ্খলায় বিরক্ত হয়ে গম্ভীর বকটা চলে যায়। সে এখন তার রহস্য জানে, সেই বন্য, হালকা, ছিপছিপে পাখিটি ভেসে বেড়ায় ও দুলতে থাকে এবং মুহূর্তেই তীরের বেগে নিচের সবুজ জগতে তার বাসস্থানে ফিরে যায়। এবার সিলভিয়া বেশ সন্তুষ্ট হয়ে আবার বিপদসংকুল পথ ধরে নিচে নামতে শুরু করে। যে ডালে সে দাঁড়িয়ে আছে তার বেশি নিচে তাকাতে সে সাহস করে না, মাঝে মাঝে তার কাঁদতে ইচ্ছে করছে কারণ তার আঙুলগুলো ব্যথা করছে এবং তার আঘাতপ্রাপ্ত পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। সে বারবার ভাবতে থাকে যে সেই অপরিচিত লোকটি তাকে কী বলবে, এবং সে যখন লোকটিকে বকের বাসায় যাওয়ার সোজা পথটি দেখিয়ে দেবে, তখনই বা লোকটি কী ভাববে!

- "সিলভি, সিলভি!" ব্যস্ত বৃদ্ধা দিদা বারবার ডাকলেন, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না, ছোট খড়ের বিছানাটা খালি পড়েছিল, সিলভি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

অতিথিটি একটি স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল এবং গতদিনের আনন্দের কথা মনে করে সে তাড়াতাড়ি পোশাক পরতে লাগল, যাতে আনন্দটা আরও তাড়াতাড়ি শুরু হতে পারে। গতকাল লাজুক ছোট মেয়েটি যেভাবে একবার-দুবার তাকিয়েছিল, তা দেখে সে নিশ্চিত ছিল যে সে অন্তত সাদা বকটাকে দেখেছে এবং এখন তাকে অবশ্যই রাজি করাতে হবে যাতে সে সব কথা বলে। এই তো সে আসছে, আগের চেয়েও ফ্যাকাশে মুখে, আর তার পুরনো ছেঁড়া জামাটা আরও জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন, এবং তাতে পাইন গাছের আঠা লেগে আছে। দিদা আর শিকারী একসঙ্গে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে প্রশ্ন করে। সবুজ জলাভূমির ধারের মরা হেমলক গাছটি সম্পর্কে কথা বলার সেই চমৎকার মুহূর্তটি এসে গেছে। কিন্তু সিলভিয়া শেষ পর্যন্ত কোনো কথা বলে না। বৃদ্ধা দিদা বিরক্তিভরে তাকে তিরস্কার করে এবং যুবকটির দয়ালু, আবেদনময় চোখদুটি সরাসরি সিলভির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে টাকাপয়সা দিয়ে তাদের ধনী করে দিতে পারে। সিলভিয়ারা এখন গরিব। তাকে সুখী করা খুবই যুক্তিযুক্ত। সে অপেক্ষা করছে গল্পটা শোনার জন্য, যা সিলভিয়া বলতে পারে।

না, সিলভিয়াকে চুপ থাকতেই হবে। হঠাৎ কী এমন হ'ল, যা তাকে বাধা দিচ্ছে এবং বাকরুদ্ধ করে দিচ্ছে? এই যে ন'বছর ধরে সে বড় হয়েছে, আর এখন যখন এই বিশাল পৃথিবী প্রথমবারের মতো তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন কি একটা পাখির জন্য তাকে সেই হাত ফিরিয়ে দিতে হবে? পাইন গাছের সবুজ ডালপালার মর্মরধ্বনি তার কানে

বাজছে, তার মনে পড়ছে কীভাবে সাদা বকটা সোনালি বাতাসের মধ্যে দিয়ে উড়ে এসেছিল এবং কীভাবে তারা একসঙ্গে সমুদ্র ও সকাল দেখেছিল। সিলভিয়া আর কথা বলতে পারে না; সে বকটার গোপন কথা বলতে পারে না, তার জীবন কেড়ে নিতে পারে না।

সেই বিশ্বস্ততা, যা সেদিন দিনের শেষে অতিথিকে হতাশ হয়ে চলে যেতে দেখে তীব্র বেদনা অনুভব করেছিল। যা একটা কুকুরের ভালবাসার মতোই তাকে সেবা করতে, অনুসরণ করতে এবং ভালবাসতে পারত! অনেক রাতে সিলভিয়া অলস পায়ে হেঁটে আসা গরুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় চারণভূমির পথে তার বাঁশির সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেত! তার বন্দুকের তীক্ষ্ণ শব্দে থ্রাশ ও চড়ুই পাখিদের গান থেমে যেত, তাদের সুন্দর পালকগুলো রক্তে ভিজে রঞ্জিত হয়ে উঠত। তাদের সেই নীরব হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার করুণ দৃশ্য দেখে সে তার নিজের দুঃখও ভুলে যেত।

পাখিরা কি তাদের শিকারীর চেয়েও ভাল বন্ধু হতো, কে বলতে পারে? তার কাছ থেকে যে সম্পদই হারিয়ে যাক না কেন, বনভূমি আর গ্রীষ্মকাল তোমরা তাকে মনে রেখো! তোমাদের উপহার ও সৌন্দর্য নিয়ে এসো এবং এই একাকী গ্রামের মেয়েটিকে তোমাদের গোপন কথাগুলো বলো!

একমুঠো নিঃশ্বাস

বিষ্ণুপ্রিয়া

আজ যেন এক উৎসব উৎসব ভাব অফিসে। সেজেগুজে বেশ দেখাচ্ছে কনফারেন্স হল। ছোট বড় ৮ থেকে ১৮দের সমাগম হয়েছে, কারণ প্রতি বছরের মতো আজ হচ্ছে 'bring your kids to work day'। মা বাবারা ছেলে মেয়েদের অফিসে নিয়ে এসেছে নিজেদের কাজকর্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। বড় হয়ে কেমন কেরিয়ার বেছে নিতে পারে সেটার কিছুটা আইডিয়া পাওয়ার জন্যে। বাচ্চাদের ভারি উৎসাহ। প্রথমত পড়াশোনা নেই। তাছাড়া কত রকমের অ্যাক্টিভিটি ওদের জন্য যত্নে সাজানো হয়েছে। নতুন বন্ধু পাবারও ভাল সুযোগ এটা। পিৎজা, চিপস্, সোডা আর ক্যান্ডির ছড়াছড়ি, জাংক ফুডের ছয়লাপ। বাবা মায়ের কোনো সতর্কবাণীও নেই আজ।

রোহিনী আর রুবিনা যখন মিডল স্কুলে পড়ত অদিতি প্রতি বছর এই দিনে ওদের নিয়ে আসত। ছবিতে ধরা আছে সেই সুখস্মৃতি। মা'র কাজ নিয়ে ওরা রীতিমতো গর্বিত ছিল। একে সিঙ্গল মম, তার ওপর রোজ এত শক্ত কাজ করে ওদের জন্য। বড় হয়ে মায়ের মতো হতেই হবে দুই যমজ বোনকে। বাবাকে ওদের একটুও মনে পড়ে না। সেই কোন ছোট্টবেলায় ওদের ফেলে বাবা ব্রাজিলে চলে গেছে ইসাডোরা রডরিগেজের সাথে। অদিতি অবশ্য পরে বলেছে ওদের দুজন হাফ ব্রাদারও আছে, ফিলিপ আর র‍্যাফায়েল। ওরা সব্বাই একসাথে বাবার জন্মশহর রিও ডি জ্যানেরোতে থাকে। ওদের দেখলে কীরকম লাগত রুনি ও রুবির কে জানে!

সে সুযোগ অদ্রে দেয়নি মেয়েদের বা অদিতিকে। পাকাপাকিভাবে বিবাহ বিচ্ছেদই শুধু নয়, ইচ্ছে করেই সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অদ্রে মেয়েদের সাথে। দায়িত্বও। অদিতির কোনো এক্সপেক্টেশন আগেও ছিল না আজও নেই। মেয়েরা বোঝে মম কখনো আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে ওদের অধিকারের দাবি নিয়ে যাবে না বাবার সামনে, যখন প্রেম ভালবাসা সম্মান কিছুই নেই বা কর্তব্য বোধের বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই।

চিরকাল নিজেকে অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত এক কাজ-পাগল মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেনি অদিতি। ভাগ্যিস! কারণ কাজের মতো থেরাপি আর নেই। তা না হলে এতদিনে ও হয়তো পাগলই হয়ে যেত চরম আঘাত আর দুঃসহ শূন্যতায়। প্রতিদিনের রুটিন জীবনের ঝড় ঝাপটা একটু ভোঁতা করে রাখে। কাজের ভীড়ে ওর ভয়ংকর নিঃসঙ্গতাও চাপা পড়ে থাকে। বড় বাচোঁয়া। নয়তো কত মানুষকে ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার নিয়ে ভাবতে হয়। কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ খেতে হয়। কাউন্সেলিংয়ে যেতে হয়। হতাশা ছাড়া অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্টের সেশনে নিয়মিত থাকতে হয় জীবন যাপনে ব্যালেন্স ফিরিয়ে আনতে। আরও কতকিছু আনুষঙ্গিক ঝামেলা বইতে হয় চাকরি বাঁচানোর জন্যে। সহজ নয়। দৈনন্দিন গতানুগতিক এই কাজের ছন্দকে অদিতি তাই শ্রদ্ধা করে। সহকর্মীরা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, "আরো কয়েকটা দিন বাড়িতে রেস্ট নিলেই তো পারতে। এত তাড়াহুড়োর কী ছিল?" অদিতি ভাবে ওরা বোঝে না বাড়িটা যে চতুর্দিক দিয়ে ওকে গিলে ফেলতে চায়। সারাক্ষণ রুবিনার সাথে কথা বলেই চলে। অজান্তেই। রুবির চেনা ডিওর গন্ধটা বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। বরাবরের অভ্যেস। নাড়ির টান। সকালে কফির প্রথম চুমুকের আগে শূন্য বুকটা হুহু করে ওঠে বার বার। একটা চাপ ঠেলে উঠে আসে গলা পর্যন্ত। কষ্ট হয় নিঃশ্বাস নিতে। দম বন্ধ হয়ে আসে। একবার অফিসে পৌঁছাতে পারলে কিছুটা নিস্তার। ডেস্কটপে লগইন করে নতুন ইমেইলের ওপর চোখ বুলায়। জানে বেলা যত বাড়বে, বুকের চাপটা কমবেশি কমবে বাড়ি ফেরা অবধি। তারপর আবার সেই সর্বগ্রাসী দুর্ভাবনা আর রাতের দুঃস্বপ্ন। কাল স্পষ্ট দেখল গাড়িটা বালিতে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে; অনেকগুলো গাড়ি একসঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে। কোনোমতেই বেরোতে পারছে না কেউ। অদিতিও না। ট্র্যাপ্ড। চোরাবালি। ভোর রাতের স্বপ্ন কি ফলে? ফললেই বা কী? যা চুড়ান্ত ক্ষতি তার হয়ে গেছে এর বেশি আর কিছুই হতে পারে না।

আজকাল বেশি করে মনে হয় বয়স বা অসুস্থতার সাথে মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো সময় একটা টাইম-লাইন মুছে যেতে যেতে দপ করে জ্বলে ওঠা একটি বিন্দুতে পরিণত হতে পারে। ক্ষীণ আশা। পরক্ষণেই নিভে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ। সব শেষ। ওই বন্ধ চোখ আর কোনোদিন খুলবে না। পৃথিবীর রূপ রঙ শুষে নেবার কোনো তাগিদ নেই তার। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, স্টক

মার্কেটের ট্রেন্ড, এপিডেমিকের আগামী বার্তা বা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের ভবিষ্যৎ বাণী চ্যানেলে চ্যানেলে, পডকাস্টে, সমাজ মাধ্যমে ঘোরাফেরা করে | অথচ একটি আস্ত জীবন নিঃশেষ হবার পূর্বাভাস কেউ দিতে পারে না | অসহায় ছটফটানিই জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে থেকে যায়|

অদিতির মনে হচ্ছে সেই চাপটা আবার বুকে ঠেলা দিচ্ছে| হুল ফোটানো যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ হয়ে আসছে | হৈহৈ রৈরৈ পড়ে গেছে অফিসে | 911 এইমাত্র অদিতিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে ই আর-এ | ম্যাসিভ কার্ডিয়্যাক অ্যারেস্ট | সি পি আর-এ কিছুটা সামলালেও হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হয়েছে ফর ক্রিটিক্যাল ইন্টারভেনশন| এমার্জেন্সি কনট্যাক্ট রোহিনীকে খবর দিতে হয়েছে | রোহিনী ফোনে এইচ আরকে জানিয়েছে ও রওনা হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে | এদিকে কনফারেন্স হলে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা বাবা মা'র পাশে দাঁড়িয়ে খুব সিরিয়াসলি প্রার্থনা করেছে মিস অদিতির সুস্থতার জন্যে | ডিরেক্টর অ্যালেকজ্যান্ডার হ্যানসন মাথা নেড়ে শুধু বলেছেন, "টু সুন, ইটস টু সুন | এত বড় আঘাত | অদিতির ট্রমা সারতে সময় নেবে| একমাস মোটেই যথেষ্ট নয় |" সহকর্মীরা সকলেই বোঝে এই ক্ষত সারার নয়| এ সারাটা জীবনের|

হাসপাতালে কার্ডিয়্যাক ইউনিট পাঁচতলায়, আকাশের আরেকটু কাছে | অন্ধকার যত নিঝুম হয়, রুবিময় হয়ে যায় রাতের বুকে তারারা | মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে ফেলবে রুবিকে | সকালে জানলার বাইরে হলুদ ফুলগুলো রুবির রোদমাখা হাসি নিয়ে ডাকে অদিতিকে| জড়িয়ে রাখে ওকে এক অপরূপ অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে | ছোটবেলায় গলা জড়িয়ে আবদার করত রুবি পদিপিসীর বর্মিবাক্স শোনার জন্য | অতি পরিচিত সেই হারবাল শ্যাম্পুর গন্ধ নাকে আসে| রুবির একরাশ সোনালি চুল হাওয়ায় উড়ছে | আলতো করে ছুঁয়ে যাচ্ছে অদিতির কপালে, গালে|

গতমাসে অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে রোহিনী ও ম্যাথিউর ইচ্ছেমতো ছোট্ট করে মেয়ের বিয়ের আয়োজন করেছিল অদিতি | জার্সি শোরের নিরিবিলিতে একেবারে সাদামাটা অনুষ্ঠান, কিন্তু আন্তরিক, ঠিক যেমনটি ওরা চেয়েছিল; কোনো আতিশয্য নয়, সোশাল মিডিয়ার জন্য হৈহৈ ফটো সেশন নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা মুহূর্ত রুবিনা ধরে রাখবে ওর ক্যামেরায় | যে ন্যাট জিওর এত দক্ষ ফটো-জার্নালিস্ট, সেই রুবিনা সিলভা ছাড়া অন্য কোনো পেশাদার ফটোগ্রাফার বিয়ের ছবি তুলবে রুনি ভাবতেই পারে না| রুবির ছবি যে এক একটি অসামান্য গল্প এঁকে যায় | আসল তো দেখা, ক্যামেরা মাধ্যম মাত্র, ফর দ্য ইনক্রেডিবল স্টোরিটেলিং অ্যান্ড স্টানিং ভিজুয়াল্স|

মম এবং ম্যাথিউর বাবা মা'র আশীর্বাদ ও বাকি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের শুভেচ্ছাই যথেষ্ট নতুন জীবনের শুভ সূচনার পথে রোহিনীর বিশ্বাস | জন্মসূত্রে রোহিনী অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক ক্যাথলিক; আর ম্যাথিউ জুয়িশ, যদিও ওরা কেউই নিয়মিত মন্দির, চার্চ বা সিনাগগে যায় না | ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মিকতায় আস্থা বেশি এই দুই তরুণ বৈজ্ঞানিকের | মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী এরা, কোনও পুরোহিত পাদ্রী বা র‍্যাবাই নয়| একজন সেক্যুলার অফিসিয়েন্ট বিয়ে প্রিসাইড করবে এমনই ওদের চাহিদা| অদিতি সম্মান করে ওদের এই মানসিকতা এবং তেমনই ছিমছাম ব্যবস্থা করেছিল অ্যাসবারি পার্কের ওয়াটারফ্রন্টে|

"ইউ মে কিস দ্য ব্রাইড নাউ |"

রুবি ক্যামেরাবন্দী করছিল রুনি ও ম্যাটের এই অঙ্গীকারের মুহূর্তটি, অদিতি করছিল নিজের সেলফোনে| পুত্র পুত্রবধূর মধুর মিলনের স্বাক্ষরকে ধরেছেন জশুয়া ও ম্যারিয়ন ওদের ক্যামেরায় | মেয়ে জামাইকে জড়িয়ে ধরে অনেক আশীর্বাদ করে অদিতি বলেছে ওদের পথ এক হোক সারাজীবন | ওরা একে অপরের আনন্দে-সুখে, ঝড়-ঝঞ্ঝায়, বিপদে-আপদে পাশে থাকুক |

হঠাৎ রুবির দিকে হুড়মুড় করে তেড়ে এল একটা লাল হন্ডা সিভিক | ক্যামেরা ছিটকে বালির ওপর গিয়ে পড়ল, তারপর গড়াতে গড়াতে ঢেউয়ের দিকে এগিয়ে চলল | তীব্র দমফাটা আর্তনাদ রুবির| গুলিবর্ষণে হলদেটে বালি রক্তে ভিজে গেল | রুবির গুলিবিদ্ধ নিথর দেহে ব্রাইডসমেডের গোলাপী ড্রেসটা এখন রক্তাক্ত লাল | পাশে আরেকটি কমবয়সী ছেলের চিৎকার নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায়| ওর পাশে একটা কালো সবুজ হার্লে ডেভিডসন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে | রক্তের ছিটে লেগে আছে বাইকটার শরীরে | বালিতে চিকচিক করছে একটা হ্যান্ডগান| লুকোতে চেয়েছিল ছেলেটা কিন্তু পারেনি| 911

পৌঁছানোর আগেই দুটো জলজ্যান্ত প্রাণ ফুরিয়ে গেল একমুঠো নিঃশ্বাসের অপেক্ষায়।

একটা গ্যাং যাদের স্লিচিং সংক্রান্ত দলীয় দলাদলি শুরু হয়েছিল নিউ ব্রান্সউইকে তাদেরই একজন বাইকে করে পালাচ্ছিল। হন্ডা সিভিক তাকে খুঁজতে খুঁজতে শেষমেশ পেল অ্যাসবারি পার্কের সাগরতীরে রুনির বিয়েতে রুবির ঠিক পাশে। হারিকেন সিজন নয় অথচ নিমেষে সব তছনছ হয়ে গেল জার্সির বালুচরে। ঝড় যখন মৃত্যুগন্ধ ছড়িয়ে দেয়, বেঁচে থাকা জীবনগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যায় চিরতরে। অর্থহীন র‍্যান্ডম ভায়োলেন্সের কোনো ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না, প্রতিকারও হয় না। বাইস্ট্যান্ডারড্ মানুষের প্রাণ যায় বেঘোরে। আর অদিতি, রুনি, ম্যাথিউরা বাঁচার অভিনয় করে চলে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। রুবির মতো আলোকচিত্র শিল্পীর শেষ ছবি কারুর তোলা হয় না। ওর সর্বশেষ গল্প অনুচ্চারিতই থেকে যায়। ওর স্বপ্ন অধরা। আর রুনি ও ম্যাথিউর আগামী প্রতিটি বিবাহ বার্ষিকী এক ভয়াবহ কোলাজের মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ।

- "হাই অদিতি লুক হু'জ হিয়ার টু সী ইউ।" ফিলিপিনো নার্স, কার্মেলিটার চোখে ঝলমলে হাসি।

একরাশ হলদে টিউলিপ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। অদিতির ম্যানেজমেন্ট অ্যাসিসটেন্ট মলিসার ছোট্ট মেয়ে এমিলি। ও কিছুতেই ওর মাকে অনলাইনে ফুল আর কার্ড পাঠাতে দেয়নি। ও মিস অদিতিকে হাগ করে নিজে হিলিং উইশ জানাতে চায়। তাই আজ সকালে মলিসা মেসেজে পাঠিয়েছে অদিতির অনুমতির জন্য। এখন মা ও মেয়ে অদিতির বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। অদিতি একহাতে চোখে টিশু চেপে আবেগ আটকে রাখার চেষ্টা করল। অন্যহাতে নানা টিউবের ফাঁক দিয়ে কাছে টেনে নিল এমিলিকে। ছোট্ট রুবি যে এই মুহূর্তে ওর বুক জুড়ে। এমিলির নরম স্পর্শ ওর সারা অঙ্গে। সাঁঝবেলার পড়ন্ত ফিকে আলোয় অনেকটা রোদ্দুর এমিলির চোখে। অদিতি দেখতে পাচ্ছে সেই রোদে ভিজে যাচ্ছে রুবির স্বপ্নময় দুই চোখের পাতা।

মোহমুক্তি

সুজাতা দাস

হঠাৎ করেই কথাটা বলে ফেলে নিজেই অবাক হলেন অপু, মানে অপূর্ব চট্টরাজ। নিজেকেই মনে মনে প্রশ্ন করলেন কীভাবে মুখে এল কথাটা, যা তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি! অপুর অসতর্কে বলে ফেলা কথাটা তীরের মতো ছুটে এসে বিঁধল শমিতা দেবীর বুকে। তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখছিলেন নিজের মনে। চমকে তাকালেন ছেলের দিকে; একটা ব্যথা অনুভব করলেন বুকের বাঁপাশটাতে। অবাক হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ছেলের মুখের দিকে। ভাবলেন এটি তাঁরই সন্তান তো, একেই তিনি নিজে হাতে তিল তিল করে মানুষ করেছেন!

কথাটা বলে ফেলে মাথা নিচু করে আছে অপু, মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলেন মা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে। ছোট্ট থেকেই মায়ের এই দৃষ্টিকে মনে মনে ভয় পায় অপু।

কথা খুব কম বলেন শমিতা দেবী। প্রচন্ড পার্সোনালিটি অপুকে মায়ের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি কখনও। তাই শমিতা দেবীর ব্যক্তিত্বের বর্ম ভেদ করা অপুর কর্ম নয়। যখন তাকিয়ে থাকেন অপুর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে, সেসময় অপুর মনে হয় মা নিশ্চয়ই ভেতর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন চশমা ছাড়াই। ঐ দৃষ্টির সামনে পড়ে আমতা আমতা করতে থাকল অপু, বাকি কথা শেষ না করে মাথা নিচু করে রইল নিঃশব্দে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ছাড়লেন শমিতা দেবী। অপু মায়ের হেঁটে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, কারণ শমিতা দেবীর অভিব্যক্তিতে রাগ বা অভিমান কোনটাই ধরা পড়ল না অপুর কাছে শুধু অবাক হওয়া ছাড়া!

রাতে খাওয়ার টেবিলে কোনও কথা হ'ল না, কারণ সেই অবস্থায় কেউই ছিলেন না। অপু নিজেও হয়তো ভেঙেচুরে গেছেন মনে মনে, নিঃশব্দে খাচ্ছিলেন তিনি মাথা নিচু করে। অপুর বাবা চলে যাবার পর থেকে শমিতা দেবী রাতের খাবার খান না। কিন্তু অভ্যাস বশতঃ আজও ভাঙা মনটা নিয়ে টেবিলে এসে বসেছেন ছেলের খাবার সময়। এই অভ্যাসটা ছাড়তে পারেননি এখনও তিনি। যা তিনি সেই ছোট্ট থেকে করে

এসেছেন, আজও তা পালন করতে এতটুকু ভুল করলেন না। অপুর খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়ানোর সময় অলি বলল, "মা আপনাকে একটু কিছু দিয়ে আসি ঘরে?"

ঘুরে তাকালেন শমিতা দেবী অলির মুখের দিকে, তারপর বললেন, "না মা, তুমি তো দেখছ কয়েক বছর ধরে আমি রাতে আর খাই না।" তারপর ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলেন নিজের মনে। আজ খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে, ঢুকে পড়লেন বাথরুমে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে – এখনও কানে বাজছে অপুর বলা কথাটা।

তার আত্মঅভিমান তাঁকে কাঁদতে বারণ করা সত্ত্বেও শমিতা দেবী আজ কাঁদছেন। মনে জমানো অনেক কান্না, যা অনিরুদ্ধর জন্যও কোনওদিন কাঁদতে পারেননি তিনি, অপু কষ্ট পাবে বলে। আজ সব ঝরে পড়তে লাগল বিনা বাধায়।

কত কষ্ট করে এই 'জুয়েলরি ম্যানশন' তৈরী করছেন একমাত্র তিনি আর তাঁর স্বামী অনিরুদ্ধই জানেন – তিল তিল করে নিজেদের সবটুকু দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই স্বপ্ন। অনিরুদ্ধর মৃত্যুর পরেও তিনি এতটুকু আঁচ আসতে দেননি এই জায়গায়। প্রতিটি কর্মচারী তাঁকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা করে। আজ পর্যন্ত তিনি কারো সাথে উঁচু গলায় কথা বলেননি। সকলে তাঁকে সম্মান করে। শমিতা দেবীর মুখের কথা শেষ হবার আগেই সবাই তৈরী হয়ে যায় সেই কাজ করার জন্য। সকলে তাঁকে 'মা' ডাকে। বৃদ্ধ সরকারবাবু মেয়ের মতো ভালবাসেন শমিতা দেবীকে। তাঁর ভয়, তাঁর অবর্তমানে যেন সরকারবাবুকে কোনও অসম্মান না করে ফেলেন অপু। এখনকার মানুষের ধৈর্য অনেক কম এটা শমিতা দেবী বোঝেন।

অপুকে মানুষের মতো মানুষ করবার গর্বে তিনি ছিলেন গরবিনী। সত্যিই কি মানুষ করতে পেরেছেন? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন শমিতা দেবী। স্নান সেরে এসে বসলেন তাঁর পছন্দের দোলনা চেয়ারে। হাজার চিন্তা ছেয়ে আছে মনের গভীরে, ছোট ছোট কোলাজে সেগুলো ঘুরতে লাগল চোখের সামনে একের পর এক।

লেখাপড়ায় তুখোড় ছিল অপু, তাই কালিম্পং-এর কনভেন্টে রেখে পড়িয়েছেন অনিরুদ্ধ। ছুটিছাটায় ছেলের কাছে অনিরুদ্ধই বেশি যেতেন, তাই বাবার সাথেই বেশি সখ্যতা ছিল অপুর। ছুটিতে বাড়ি এলে দুজনের খুনসুটিগুলো উপভোগ করতেন শমিতা দেবী। হয়তো তিনি নিজের বর্ম সরিয়ে অপুর কোমল হৃদয় ছুঁতে পারেননি, তাই আজ তিনি ব্রাত্য। যেদিন অপু এই পৃথিবীতে এল তখন মমতাদেবী, মানে অপুর ঠাকুমা বেঁচে ছিলেন, সেই বৃদ্ধা মানুষটি সারাক্ষণ অপুকে আগলে রাখতেন। তিনি যে কোথায় রাখবেন অপুকে ঠিক করতে পারতেন না।

মাঝে মাঝে অনিরুদ্ধ মাকে বলতেন, "মা তোমার যত্নে ছেলেটা নরম মনের হয়ে যাচ্ছে, ওকে মাটিতে পড়তে দাও। একটু ব্যথা পাক তবে তো ও পুরুষ হয়ে উঠবে।" কিন্তু মমতাদেবী ছেলেকে বকতেন সেসব শুনে।

অপু যেদিন কালিম্পং-এর স্কুলে পড়তে গেল, ঠাকুমাই বোধহয় সেদিন সবথেকে বেশি কেঁদেছিলেন। হঠাৎ ছোটবেলার একটা কথা মনে পড়ল শমিতা দেবীর – কেউ একজন অপুকে চকলেট খেতে টাকা দিচ্ছিলেন; অপু বলেছিল, "ছোটদের টাকা দিতে নেই চকলেট দিও।" সেই ছোট ছেলেটা কখন যেন সত্যিই বড় হয়ে গেছে, তারও যে একটা ছেলে হয়ে গেছে সেও বাবা হয়ে গেছে একথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন শমিতা দেবী। সত্যিই তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস অপু, আমি বুঝে উঠতে পারিনি রে ক্ষমা করিস পারলে, নিজের মনেই বললেন শমিতা দেবী।

কিছুই ভাল লাগছে না আজ, একটা অস্থিরতা গ্রাস করছে একটু একটু করে, ভেতরের ভাঙাচোরা সত্তাটা ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইছে বারে বারে, যা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। আজ অনিরুদ্ধর কথাও খুব মনে পড়ছে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে বলে উঠলেন – আজ যে তোমাকে খুব দরকার ছিল অনি, তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে!

একদিকে ব্যবসা দাঁড় করানো, সোনার দাম ওঠা-নামায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ছিল। ক'দিন ধরে একটু বেশিই টেনশন চলছিল ব্যবসা নিয়ে, তাতে প্রেসারটাও বাড়ল; কতবার ডাক্তার নিয়োগীকে দেখানোর কথা বললেন শমিতা দেবী কিন্তু অনিরুদ্ধ শুনলেন না কোনও কথা। বলতেন আমার লোহার শরীর কেন চিন্তা করো শমিতা? আমার কিচ্ছু হবে না। কিন্তু একদিন সত্যিই হ'ল, অনিরুদ্ধ চলে গেলেন ঘুমের ঘোরে, নিজেও হয়তো জানতে পারেননি মৃত্যু কখন ডেকে নিয়েছে তাঁকে। আজও অবাক লাগে শমিতা দেবীর এত ঘুম কোথা থেকে ঘিরে ধরেছিল তাঁকে সেদিন! পাশে শুয়ে থাকা অনিরুদ্ধর চলে যাওয়া তিনি টেরও পেলেন না একেবারে!

অভিমান করেছিলেন স্বামীর উপর তাঁকে না বলে যাবার জন্য। কাঁদেননি কারণ তিনি শক্ত না থাকলে সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যেত, বরং অনিরুদ্ধর স্বপ্নকে আরও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছেন তিনি সেই অভিমান বুকে নিয়ে।

কালিম্পং-এর পড়া শেষ করে বিদেশে পড়তে গেল অপু কয়েক বছরের জন্য। ওখানেই আলাপ অলির সাথে। বিদেশ থেকেই মাকে সব জানিয়েছিল অপু। তিনি আপত্তি করেননি, কারণ তিনি সবসময় সবকিছু মানিয়ে নিয়েই চলছেন সারা জীবন, তাই এটাও মেনে নিলেন। অপুর বিয়ে দিয়েছেন। অপুর ছেলে হওয়ার দিন নার্সিং হোমে বসে থেকেছেন সারাটা দিন। বংশের প্রদীপ এল তাঁর ঘরে, একদম অনিরুদ্ধর মতোই দেখতে তাঁদের নাতি, শঙ্খ। ছোট্ট ছোট্ট পায়ে হেঁটে চলে বেড়ানো শঙ্খকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

স্বভাব বিরুদ্ধভাবে চোখের কোনটা ভিজে উঠল, আর ভাবতে পারছেন না। কাগজ কলম টেনে নিয়ে শমিতা দেবী লিখতে বসলেন –

অপু,

এই চিঠি যখন তোর হাতে পৌঁছাবে আমি তখন তোর থেকে অনেক দূরে, হয়তো তোর ধরা ছোঁয়ার বাইরে। না, আত্মাহুতি নয়, আত্মাভিমানও নয়, শুধু নিজেকে খুঁজতে বেরোলাম। হয়তো আর তোর সাথে দেখা হবে না কখনও। নিজেকে অপরাধী ভাবিস না, এতে তোর কোনও অপরাধ দেখিনি আমি। স্বাধীনতা সকলেরই কাম্য অপু, তুইও তাই চেয়েছিস।

কিন্তু যে স্বপ্ন আমি আর তোর বাবা অনেক কষ্ট করে নিজে হাতে সাকার করেছি, সেটাও আমরা দুজনে তোর মতোই সন্তান স্নেহে পালন করেছি। তোর বলার অনেক আগেই আমি তোর নামে সব লিখে দিয়েছিলাম অপু, হয়তো সব ছেড়ে অবসরও নিতাম। আসলে সবই ভালর জন্যই হয় বোধহয়, অনেক ভাল থাকিস।

মা

উষার আলো ফুটতে চলেছে, এই সময়টা ভীষণ পছন্দের শমিতা দেবীর, কিন্তু আজ আর সময় নেই সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার। তৈরী হয়ে নিলেন খুব তাড়াতাড়ি, একটা ছোট ব্যাগে সামান্য টুকিটাকি কিছু গুছিয়ে নিলেন। যেখানে তিনি যাচ্ছেন অনেক কিছুরই সেখানে প্রয়োজন নেই, অনাড়ম্বর জীবন যাপনেই অভ্যস্ত সেখানকার সকলে।

ভোর হবার আগেই পা রাখলেন রাস্তায়, দারোয়ান রামদীন বেরনোর সময় একবার জিজ্ঞাসা করল, "মেমসাব আপকো গাড়ি নাহি চাহিয়ে?"

শমিতা দেবী একটু হেসে উত্তর দিলেন, "নহি রামদীন, আচ্ছে সে রহেনা।" বলে রাস্তার দিকে পা বাড়ালেন।

পেছনে ঘুরে দেখলেন একটা অবাক প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে রামদীন।

তিনি তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে চললেন নিজেকে খুঁজতে মহামানবের ভীড়ে।

যা একদিন কালিম্পং-এর এক ছোট্ট গ্রামে নিশ্চুপে, সবার অগোচরে তৈরী করেছিলেন দুজনে মিলে, সেটাই হয়তো চলবে আবহমান কাল ধরে নিজেকে খুঁজতে থাকা মায়েদের হাত ধরে।

একটা মিষ্টি সকাল দেখতে পেলেন শমিতা দেবী ট্রেনের জানালার পাশে বসে, কারণ আজ তিনি সাধারণের সাথে মিশে যেতে পেরেছেন।

বুড়ো-ছোঁড়ার জাঁতাকলে

শান্তনু চক্রবর্তী

সপ্তাহ তিনেক হ'ল এই ছোট্ট শহরটায় চাকরি নিয়ে এসেছে প্লাবিনী। তিন সপ্তাহেই বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ভারতবর্ষে এখনো একা মেয়েদের পক্ষে কোথাও গিয়ে বাড়ি বা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থেকে চাকরি করা বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। অবশ্য এমন নয় যে সব মেয়েকেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়! কিছু ভাগ্যবতী মেয়েদের জন্য হয়তো এমনটা ঘটে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে। এবং এই ব্যাপারটা সবার জন্য এক মাত্রার নয়। কারুর কারুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু বেশীরকম সমস্যাজনক। বিশেষ করে সেই একা মেয়েটির বয়স যদি পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে হয়। সেক্ষেত্রে ভাড়া পাওয়াই হয়তো মুশকিল হয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই বয়সী মেয়েরা হয় ডিভোর্সী এবং ডিভোর্সী মেয়েটির বেলায় লোকজন সাধারণভাবে মেয়েটিকেই দোষ দিয়ে থাকে। এই দোষ দেওয়ার খেলায় পুরুষ এবং মেয়ে একইরকম নিপুণ; বরং মেয়েরা কিছুটা এগিয়ে। কিন্তু প্লাবিনীর মতো অল্পবয়সী মেয়ে বা ষাটোর্ধ কোনো ভদ্রমহিলা হলে কুমারী বা বিধবা হবার সম্ভাবনা বেশী, আর তখন অনেক সময় ঝামেলাটা কম হয়। তাহলেও কুমারী মেয়েদের আবার চট করে পান থেকে চুন খসলে বদনামের ভাগীদারও হতে হয়, তাই পা ফেলতে হয় অত্যন্ত সাবধানে। একত্রিশ বছর বয়সী প্লাবিনী এখনো কুমারী। সেজন্য ও যথেষ্ট সাবধানী। কিন্তু কথা আছে না যে পুরুষমানুষের বয়ঃসন্ধি নাকি কখনোই কাটে না? কথাটা যে কত বড় সত্যি তা এই অল্পদিনেই হাড়েহাড়ে টের পেয়েছে প্লাবিনী। স্ট্যাটিস্টিকসে পিএইচডি কমপ্লিট করবার পর নেট ক্লিয়ার করে বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এই ছোট কলেজটায় চাকরি পেয়েছে ডঃ প্লাবিনী ব্যানার্জী। কলকাতা থেকে খানিকটা দূর হওয়ায় সে খুশিই হয়েছিল প্রথমে। দিদির মতো বিদেশেও যেতে হ'ল না, প্রতি উইকেন্ডে বাড়ি চলে আসার উপায়টাও খোলা রইল, আবার কলকাতার ভিড় থেকেও বাঁচা গেল। এমনিতে ছোটবেলা থেকেই এসব ব্যাপারে ওদের দু'বোনের মানসিকতায় অমিল। মা-বাবাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবার কথা ভাবতেই পারে না প্লাবিনী, আর দিদির মতো আর্বানোফিলিয়া বা মহানগরপ্রীতিও ওর নেই। তবু সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর এখন সে রোজ নিজেকে একটাই প্রশ্ন করছে, ব্যাপারটা কি একটু তাড়াহুড়ো হয়ে গেল? এই মুহূর্তে অন্য কোথাও পায়নি ঠিকই, তবে আরো একটু অপেক্ষা করলে সে আইআইটি বা আইএসআই – এরকম কোথাও একটা পেতে পারত হয়তো। কিন্তু আপাতত এই সই, এটাই শেষ বলে ধরে নিতে হবে কেন?

এই শহরটায় সব কিছুই কাছে কাছে। বাস, অটো, টোটো এসব থাকলেও নিজের একটা টু-হুইলার থাকলে কোনকিছুর ওপর নির্ভর করতে হয় না। প্লাবিনী তাই ওর স্কুটিটা এখানে নিয়ে এসেছে। বাজারহাট, কলেজ, মুদিখানা, ওষুধের দোকান সবখানেই ও স্কুটি নিয়ে চলে যেতে পারে। ওর এই ফ্ল্যাট থেকে সবকিছুই অল্প দূরে। হাঁটা দূরত্বে যে ছোটখাটো দোকানপাট নেই, তা নয়, কিন্তু নিজের একটা বাহন থাকলে সেটাকে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিন-চারদিন যেতে না যেতেই সে বুঝে গেছে অনেকেই বেশ গোল গোল চোখে ওকে দেখে যখন সে স্কুটিটা নিয়ে বার হয়। বিশেষ করে বয়স্ক লোকেরা। ওদের পাড়াটা নিরিবিলি হওয়ায় অধিকাংশ ফ্ল্যাটেই এরকম বয়স্ক লোকেদের বাস। প্লাবিনী যখন সকাল সাড়ে নটায় বার হয় বা বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফেরে, সবসময়ই এই পাড়ার বয়স্ক লোকেদের গলির মোড়ের চায়ের দোকানটিতে আড্ডা দিতে দেখা যায়। প্লাবিনীর ওঁদের সঙ্গে শুধু দুবেলা দেখা হয় না, কথাও হয়। কারণ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে জল খেয়ে, কিছু ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে, ইমেল, হোয়াটস্অ্যাপ্ আর খবরকাগজটা একটু উল্টেপাল্টে দেখে চান সেরে নেয় সে। তারপর বইপত্র, লাঞ্চবক্স গুছিয়ে গলির মোড়ে এই চায়ের দোকানে চা-টোস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে কলেজের উদ্দেশ্যে। স্কুটিতে কলেজে পৌঁছাতে দশ থেকে বারো মিনিট। প্রায় প্রত্যেকদিন ওর চারটে করে ক্লাস। বিকেলের দিকে প্রায়ই ল্যাব থাকে আর তখন ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাঁচটা দশ-পনেরো হয়েই যায়। আর নিজেদের গলিতে ঢুকলেই আবার ওর চা তেষ্টা পায়। সেখান থেকে চা-বিস্কুট খেয়ে তবেই বাড়ি ঢোকে। ফলে বাড়িতে ব্রেকফাস্ট বা স্ন্যাকসের পাট সে রাখে না, রান্নাবান্নার পাটটুকু রয়েছে শুধু ডিনার আর পরের দিনের লাঞ্চের জন্য। চা-বিস্কুট খেয়ে বাড়ি ফিরে চটপট ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা অ্যানাউন্সমেন্ট ওদের কলেজের ফেসবুক

পেজে পোস্ট করে দরকারি কয়েকটা ইমেলের জবাব দেয়। তারপর চান করে রান্না। রাতের রান্না থেকেই একটা অংশ বাঁচিয়ে রাখে পরের দিনের লাঞ্চের জন্য, যেটি কলেজের ফ্যাকাল্টি ক্যান্টিনের মাইক্রোওয়েভে গরম করে খায়। রান্না হয়ে গেলে ডিনার সেরে রাত সাড়ে নটার মধ্যে প্লাবিনী শুরু করে পরের দিনের ক্লাসের প্রিপারেশন। প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা প্রিপারেশনের পর শুতে রাত সাড়ে বারোটা একটা। পরদিন সকাল আটটায় ঘুম থেকে ওঠা।

তা দুবেলা গলির দোকানে চা খায় বলেই এই বয়স্ক লোকেদের সঙ্গে প্লাবিনীর দুবার দেখাই শুধু নয়, কথাবার্তাও হয়। তার থেকে সে বুঝতে পারে যে পুরুষের বয়ঃসন্ধির ব্যাপারটা কতটা সত্যি! এবারে একটু খোলসা করে বলা যাক সবকিছু।

এই চায়ের দোকানটির নাম গোলুদার চায়ের দোকান। গোলুদার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দোকানে গোলুদা ছাড়াও আরও দু-তিনটি ছেলে-ছোকরা কাজ করে। প্লাবিনী সকালে মিনিট পনেরো দোকানে বসে, তারই মধ্যে কম করেও ২০ থেকে ২৫ জনকে চা-বিস্কুট-টোস্ট অর্ডার করতে দেখে। বিকেলে আরও বেশী। বেশীরভাগই চা খেয়ে চটপট যে যার কাজে চলে যায়। কিন্তু ৭ থেকে ১০ জন বয়স্ক লোক রয়েছেন যাঁদের ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে বসে থাকতে দেখা যায়। প্লাবিনী ঘুম থেকে উঠে ওর চারতলার জানালা দিয়ে উত্তরের দিকে তাকালে এই চায়ের দোকানটি দেখতে পায়। এই বয়স্ক লোকেরা হয়তো আটটা বা তারও আগে থেকেই সেখানে বসে আছেন। প্লাবিনী সব সেরে সেই দোকানে চা-টোস্ট খেয়ে যখন স্কুটিতে উঠে বেরিয়ে যায়, তখনও অনেকেই সেখানে বসে থাকেন। এই বয়স্ক লোকেদের সবারই বয়স গোলুদার বয়সের আশেপাশে আর সেজন্যই এই দোকানটি তাঁদের মিলবার ঠাঁই। তাঁরা যা আলোচনা করেন তাতে গোলুদাকেও যোগ দিতে হয়; গোলুদা ফুটন্ত জলে চা ছাড়তে ছাড়তে বা দুধ মেশাতে মেশাতে, কাপে চা ঢালতে ঢালতে বা দোকানের ছোকরাগুলোকে এটা সেটা ধমক দিতে দিতে ওঁদের আলোচনায় অংশ নেন। কোনোদিন সেই আলোচনা বিজেপি-তৃণমূল নিয়ে, কোনোদিন ক্রিকেট নিয়ে, কখনো বা রাশিয়া-ইউক্রেন বা ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন নিয়ে, কোনোদিন 'পোসেনজিৎ' বা দেব অধিকারী বা শাহরুখ খান নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। প্লাবিনীকে দেখলে সেই আলোচনা কিছুটা স্তিমিত হয়, চোখগুলো তখন এক নিমেষে ওর দিকে ঘুরে যায়, মুহূর্তের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে সে।

প্রথম যেদিন সে বিকেলবেলা এ দোকানটায় এসেছিল, সেদিনই কিছুক্ষণ আগে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে ওর এখানকার ফ্ল্যাটবাড়িটিতে এসে ওঠা। মালপত্র সব নামিয়ে, জিনিসপত্র যে যার জায়গায় পেতে দিয়ে ট্রাকওয়ালা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা সব চলে গেলে প্লাবিনী ফ্ল্যাট লক করে এখানে চা খেতে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল একটু চা খেয়ে তাজা হয়ে বাড়ি ফিরে জিনিসপত্র খোলাখুলি করবে, চান করবে, তারপর একটু খিচুড়ি আর ওমলেট খেয়ে নিয়ে সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়বে। পরদিন থেকে শুরু হবে ওর এখানে সেটল করবার লড়াই। কিন্তু চায়ের দোকানটিতে ওকে এভাবে ঢুকতে দেখে গোলুদা এবং পাড়ার কাকু-জ্যেঠু-দাদুরা যেন একটু হকচকিয়ে গেলেন। প্লাবিনী ওঁদের চোখের ছানাবড়া ভাব দেখে একটু বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। ওদের কলকাতার ফ্ল্যাটবাড়ির পাড়ায় এরকম অনেক চায়ের দোকান, চাউমিনের দোকান, রোলের দোকান রয়েছে – সেখানে মেয়েরা কখনো একা, কখনো দোকা, কখনো বা একগাদা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে হামেশাই যায়, সেটা কোনো ব্যাপার নয়। কেউ ওর দিকে কখনো সেভাবে তাকিয়েও দেখে না। কিন্তু এখানে তা নয়। ব্যাপারটা বুঝতে প্লাবিনীর তিন-চার দিন লেগেছিল। ও ক্রমশ বুঝেছিল যদি বা কখনো ও ছাড়া অন্য কোনো মেয়ে এই দোকানে আসে, তারা আসে হয়তো নিজের স্বামীর সঙ্গে অথবা অন্য দু-তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে, ওর মতো একা নয়। সেজন্য প্রথম কদিন এই কাকু-জ্যেঠুদের ওকে এভাবে দেখে থমকে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু যে কোনো মানুষেরই সবকিছু আস্তে আস্তে সয়ে যায় আর তখন তারা স্বাভাবিক হতে শুরু করে। প্লাবিনীর বেলায়ও এঁদের তাই হ'ল।

প্রথম দুদিন প্লাবিনী এলে ওঁরা নিজেদের আলোচনা থামিয়ে কথাবার্তা সামলে নিলেও আস্তে আস্তে যখন দেখলেন প্লাবিনী হার্মলেস, ওর মধ্যে কোনো ভণিতা নেই, কোনো উন্নাসিকতা নেই, সামান্য হেসে চা-টোস্টের অর্ডার দেয়, ওঁরা কেমন আছেন তার খবর নেয়, ওঁরা জিজ্ঞেস করলে সংক্ষেপে উত্তর দেয় – তখন থেকে ওঁরাও ক্রমশ স্বাভাবিক হতে শুরু করলেন। এরপর, সম্ভবত তৃতীয়দিন, ওঁদেরই একজন, যাঁর নাম

প্লাবিনী পরে জেনেছিল পুলিনবাবু, সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললেন, "আচ্ছা মা, তুমি কোথা থেকে এসেছ? কী করো?" তখন প্লাবিনীও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। তাহলে এঁরাও ওকে শেষ পর্যন্ত সহজভাবে নিচ্ছেন। এরপর ভাস্করবাবু, ত্রিদিববাবু, সুখেন্দুবাবু, শুভব্রতবাবু, দিব্যেন্দুবাবু – এঁরাও একে একে ওর সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন, এটা-সেটা জিজ্ঞেস করলেন। সকালে সময় হয় না, কিন্তু বিকেলে ওঁরা কিছু জিজ্ঞেস করলে প্লাবিনীকেও পাল্টা জিজ্ঞেস করতে হয়। এই করতে গিয়ে অনেকেরই হাঁড়ির খবর না চাইতেই ওর জানা হয়ে যায়।

ওঁরা সবাই আশপাশের কোনো না কোনো ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকেন, প্লাবিনীর ফ্ল্যাটবাড়িতেও থাকেন এক-দুজন, যেমন ত্রিদিববাবু বা হৃষিকেশবাবু, প্রত্যেকেই রিটায়ার্ড, প্রত্যেকেই রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি বা ব্যাঙ্কের চাকরি করতেন, প্রত্যেকেই কেরানি হিসেবে শুরু করে শেষমেশ কেরানি হিসেবেই বা কনিষ্ঠতম অফিসার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। তবে সবারই মোটামুটি এক ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড হলেও সবার জীবন একই রকম নয়।

ত্রিদিববাবুর যেমন স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূকে নিয়ে সুখের সংসার। সকাল-বিকেল গোলুদার দোকানে আড্ডা মেরে দুপুরে খেয়ে-ঘুমিয়ে আর সন্ধ্যায় টিভিতে একটার পর একটা খবর দেখে ওঁর দিব্যি কেটে যায়। ছেলে ওঁরই মতো ব্যাঙ্কের চাকরি করে, তবে শুরু থেকেই অফিসার। সে বাড়ি এসে রোজই বেরিয়ে যায় – কখনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বা কখনো বৌকে নিয়ে সিনেমা-রেস্টুরেন্টে। স্ত্রী আর বৌমা কাজের মাসিকে সঙ্গে নিয়ে সারাদিন ধরে বাড়ি ঝকঝকে করার কাজ করেন।

হৃষিকেশবাবুর মনে অবশ্য অতটা সুখ নেই। বাড়িতে শুধু দুটি প্রাণী – তিনি ও তাঁর স্ত্রী। ছেলে-মেয়ে দুজনেই বাড়ির বাইরে। মেয়ে ও তার বর ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করছে, আর ছেলে বিদেশে প্রফেসর। ছেলেমেয়ের জন্য অসংখ্য স্তুতিসূচক কথাবার্তার আড়ালে একাকিত্বের দরুণ ভেতরের চাপা কষ্টটা লুকিয়ে থাকে না, হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়েই পড়ে।

পুলিনবাবু আরও দুটো ফ্ল্যাটবাড়ি পরে থাকেন। বাড়িতে শুধু তিনি ও তাঁর ছেলে। স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলে সফটওয়ারের চাকরি করে। সকাল সাড়ে সাতটা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত সে বাড়ির বাইরে থাকে। এখনো তার বিয়ে হয়নি। পুলিনবাবু তাই এঁদের মধ্যে অন্যতম যাঁকে হয়তো সারাদিনে সবচেয়ে বেশীক্ষণ এই দোকানে দেখা যায়। এবং সবচেয়ে বেশী চা-ও বোধহয় ইনিই খেয়ে থাকেন। আর প্লাবিনীকে দেখলে যেন হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ওঁর মুখের হাবভাব হয়। এমনভাবে তিনি হাঁ করে প্লাবিনীকে দেখেন আর প্লাবিনীর কথা শোনেন যে মনে হয় কোনো আটষট্টি বছরের বৃদ্ধ নন, কোনো আঠারো বছরের ছেলে ওকে দেখছে।

পুলিনবাবু ছাড়া ছোটখাটো রোগাসোগা চেহারার সুখেন্দুবাবুও সম্ভবতঃ এই দোকানে সবচেয়ে বেশী সময় কাটান। পুলিনবাবুর মতো অতটা চা খেতে হয়তো তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু ওঁর মতো কথার ফুলঝুরিও সম্ভবত কাউকে ছড়াতে দেখা যায় না। ত্রিদিববাবুর মতো ওঁর সংসারও অনেকটা একরকম – স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ। কিন্তু ছেলে এখানে থাকে না, থাকে হায়দ্রাবাদে, কোনো টেক কম্পানিতে চাকরি করে। বাড়িতে তাঁরা শুধু তিনজন। বাড়িতে যতক্ষণ তিনি থাকেন, ততক্ষণ হয় স্ত্রী নিন্দে করেন ছেলের বৌয়ের নামে, নয়তো ছেলের বৌ অনুযোগ করে শাশুড়ির নামে। এঁদের সারাদিনের বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে সুখেন্দুবাবুর আর বিশেষ কিছু বলা হয় না। তাই সকালে একপ্রস্থ চা খেয়ে একটু বাজার করে দিয়েই তিনি এখানে চলে আসেন সাড়ে আটটার মধ্যে। এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এগারোটার আগে এখান থেকে নড়েন না। বিকেল পাঁচটা বাজলে আবার চলে আসেন আর তখন ওঁর স্ত্রী-বৌয়ের সাতকাহন প্লাবিনীকেও শুনতে হয়। প্লাবিনী ছটার মধ্যে বাড়ি চলে যায়, উনি আটটা বাজলে তবেই গাত্রোত্থান করেন।

বড়সড় চেহারার ভাস্করবাবু আবার বৌ-ছেলে-মেয়ে-বৌমা কারুরই তোয়াক্কা করেন না। ত্রিশ বছর কলম পেষার কাজ করার পর পঞ্চান্ন বছর বয়সে এসে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে অফিসার হয়েছিলেন ভাস্করবাবু। আর অফিসার হয়ে জীবনের শেষ পাঁচ বছরের চাকরিতে থাকাকালীন নিজের সুদৃশ্য ফ্ল্যাট কেনবার পাশাপাশি তিনি বাড়িতেও বেশ দোর্দন্ডপ্রতাপে রাজত্ব করা শুরু করেছিলেন। স্ত্রী গৃহবধূ; ছেলে, ছেলের বৌ, মেয়ে – তিনজনেই ছোটবড় চাকরি করে। কিন্তু ওঁর প্রতাপে কাজ শেষ হলে পত্রপাঠ সকলকে বাড়ি চলে আসতে হয়। বৌকে নিয়ে সিনেমা দেখতে হলে দুদিন আগে বাপের কাছ থেকে অনুমতি নেয় ছেলে। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডিনার করতে হলে মেয়েকে কম

করে তিনদিনের নোটিস দিতে হয়। এরকম বাধ্য ছেলে-মেয়ে পেয়েও ভাস্করবাবুর নালিশের শেষ নেই। সুখেন্দুবাবু যখন স্ত্রী-পুত্রবধূর নামে এটা-সেটা বলেন, তখন ভাস্করবাবুকেও কিছু না কিছু বলতে হয়। বিশেষ করে পুত্রবধূর নিন্দে করবার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে! তবে বাড়িতে যেহেতু ওঁর রাজ চলে, তাই এখানে ওঁকে সকালে একঘন্টা ও বিকেলে একঘন্টার বেশী দেখা যায় না। উনিও বাড়িতে ত্রিদিববাবুর মতো ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখেন।

সব পাড়াতেই মাতব্বর কিছু ব্যক্তি থাকেন, দিব্যেন্দুবাবু হলেন তেমন এক ব্যক্তি। পাড়ার দুর্গাপুজোতেও তিনি এক বড় পান্ডা, তাঁদের ফ্ল্যাটবাড়িরও তিনি সেক্রেটারি। এঁরও দুই পুত্র-পুত্রবধূ রয়েছে। বড় ছেলে আর ছেলের বৌ থাকে আমেরিকায়, ছোটজন বৌকে নিয়ে এখানে। স্ত্রীও রয়েছেন। এই ছোটজনের বৌকে নিয়ে দিব্যেন্দুবাবুর অসংখ্য অভিযোগ, আবার বড় পুত্রবধূর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি। তফাৎ হ'ল, বড়বৌ চাকরি করে না, ছোটবৌ করে। শুধু তাই নয়, ছোট ছেলে এবং তার বৌ একই সঙ্গে ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকলেও বৌ পরীক্ষা দিয়ে অফিসার হয়ে গেছে, ছেলে হতে পারেনি। তাই ছেলেকে ভেড়া বলবার পাশাপাশি পুত্রবধূর কথাবার্তা, চালচলন, পোশাকআশাক, অহংকার, বাড়ির কাজে লবডঙ্কা হওয়া – এসব নিয়েও নালিশের শেষ নেই। আর যেহেতু তিনি মাতব্বর, গলায় তেমনি জোরও রয়েছে। পুলিনবাবু বা হৃষিকেশবাবু মিনমিন করে যদি দিব্যেন্দুবাবুর পুত্রবধূর পক্ষে কিছু বলে ফেলেন, তাহলে রক্ষে নেই। গলা আরও সপ্তমে উঠে যাবে। এমনিতে সুখেন্দুবাবুর কথায় ফুলঝুরি দেখা গেলেও দিব্যেন্দুবাবু এলে কেমন যেন থিতিয়ে যান। ভাগ্য ভাল, দিব্যেন্দুবাবু বেশীক্ষণ থাকেন না, যেহেতু ওঁর চরে বেড়ানো স্বভাব, তাই তিনি আড্ডা টু আড্ডা হপিং করে বেড়ান। তবে প্লাবিনী ওঁর আড়ালে পুলিনবাবু ও ত্রিদিববাবুকে বলতে শুনেছে, ভদ্রলোকের বাইরে যতটা প্রতাপ, বাড়িতে নাকি তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তাঁদের ছেলের বৌয়ের সামনে একেবারে কেঁচো।

এই ক'জন ছাড়া আর যাঁদের প্লাবিনী এই আড্ডায় দেখেছে – তাঁরা হলেন বিকাশবাবু, স্নেহাশিসবাবু ও নবারুণবাবু। এঁরা কম আসেন, এলেও বেশীক্ষণ থাকেন না, আর থাকলেও বেশী কথা বলেন না। তাই এঁদের সম্পর্কে বেশী জানে না প্লাবিনী। বিকাশবাবু আর নবারুণবাবু দিব্যেন্দুবাবুর ফ্ল্যাটবাড়িতেই থাকেন স্ত্রীকে নিয়ে, ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে, তবে কানাঘুষোয় শুনেছে বিকাশবাবুর একটু আলুর দোষ আছে, নবারুণবাবুর আছে পানাসক্তি। আর স্নেহাশিসবাবু যে আদৌ কী করেন, কোন ফ্ল্যাটে থাকেন কেউ জানে না। যখন আসেন, একটু গোবেচারা মুখে বসে থাকেন। গোলুদাই ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে চা-বিস্কুট দেন, আর গোলুদাই যেচে পয়সা আদায় করেন। মাঝের সময়টা নিঃশব্দে বসে থেকে একটু করে চা খান স্নেহাশিসবাবু। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে অসংলগ্নভাবে কিছু একটা বলেন। তারপর দাম দেওয়া হয়ে গেলে উঠে চলে যান। এই স্নেহাশিসবাবুও প্লাবিনীকে দেখলে মাঝে মাঝে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকেন, কিন্তু কখনো কিছু বলেন না। প্লাবিনী এই আড্ডায় এলে যে খুব স্বস্তি বোধ করে তা নয়। কখনো-সখনো কারুর চাউনি রীতিমত অস্বস্তিতে ফেলে দেয় ওকে। যেমন পুলিনবাবুর বা স্নেহাশিসবাবুর বা হৃষিকেশবাবুর চাউনি। যেন ওঁদের চোখে-মুখে এক আকাশচুম্বী প্রত্যাশা। যেন সেও এক বাংলা সিরিয়ালের দেবী। আরেকটি ছেলে থাকলে হয়তো তাঁরা ওকে পুত্রবধূই করে নেবেন। ভাস্করবাবু আবার কাউকেই যেমন পাত্তা দেন না, প্লাবিনীর বেলায়ও তাই। সে যেন থেকেও নেই। ত্রিদিববাবু সুখী মানুষ, উনি সংসারের কথা উঠলে বেশী কিছু বলেন না। তবে রাজনীতি বা খেলার কথা উঠলে ওঁকে থামানো মুশকিল। খেলা নিয়ে কথাবার্তা দিব্যেন্দুবাবুও বলেন। শুধু খেলা কেন, যেহেতু মাতব্বর টাইপ, তাই অন্যান্য সব বিষয়েই তাঁর মত রয়েছে। আর এরকম লোকেরা যেহেতু জেনে, না জেনে কথা বলেন, তাই ভুলও বলেন প্রচুর। খেলা নিয়ে ভুল বললে ত্রিদিববাবু চেপে ধরেন, রাজনীতি নিয়ে ভুল কথা বললে ভাস্করবাবুর হাত থেকে পালানো মুশকিল। প্লাবিনীও একদিন ওঁর একটা ভুল শুধরে দিয়েছিল, মহাভারত নিয়ে কথা বলতে গিয়ে উনি মহাভারত সিরিয়ালের সেই 'অন্ধের পুত্র অন্ধ' কথাটা তুলে দুর্যোধনের নামে সাফাই গাইছিলেন, তখন প্লাবিনী শুধু বলেছিল "এটা কিন্তু মূল মহাভারতে নেই।" তাতে উনি খেপে গিয়ে বলে উঠেছিলেন, "হ্যাঁ, তোমরা তো সব আধুনিকারা দ্রৌপদীর নামে কিছু বললে সইতে পারো না, দ্রৌপদীর মতো অহংকারী মহিলাকে কী করে সাপোর্ট করো তোমরা? জানো কর্ণকে

সুতপুত্র বলে ও প্রতিযোগিতায় নামতে দেয়নি?" প্লাবিনী যখন হেসে বলল, "এটাও মূল মহাভারতে নেই।" তখন আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। প্লাবিনীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তিনি সুখেন্দু-বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, "আজকালকার মেয়েরা, কী বলব সুখেন্দুবাবু, বাড়িতে তো রোজ একই নমুনা দেখছি, এখন এখানে এসেও দেখতে হচ্ছে!" শান্তিপ্রিয় ত্রিদিববাবু তাড়াতাড়ি সামনের টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের কথা নিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেন।

আর যাঁরা রয়েছেন যেমন হৃষিকেশবাবু বা নবারুণবাবু বা বিকাশবাবু – এঁদের সঙ্গে বিশেষ কথা হয় না প্লাবিনীর। তবে লোকে যে বলে বিকাশবাবুর আলুর দোষ রয়েছে, তা হয়তো সত্যি। মাঝে মাঝেই তিনি প্লাবিনীকে আপাদমস্তক দেখেন। কিন্তু কিছু বলেন না। তবে স্বস্তির ব্যাপার হ'ল উনি আসেন কালেভদ্রে। অন্যরা সেভাবে ওকে দেখেন না, তার কারণও খুবই স্বাভাবিক। এরকম মফস্বল শহরের ব্যাপারে অল্পবিস্তর আইডিয়া রয়েছে বলে প্লাবিনীর পোশাকআশাকও অত্যন্ত সাধারণ। জিনস-টি শার্ট-শর্টস-স্কার্ট এসব ও এখানে আনেনি। অধিকাংশ দিনই ও চুড়িদার-কামিজ পরে। শুধু সেকেন্ড ফ্রাইডেতে যখন ফ্রেশার্সদের ওয়েলকাম করা হয়েছিল, সেদিন ও শাড়ি পরেছিল। ফিরতে দেরী হয়েছিল বলে ও বিকেলে আর চায়ের দোকানে ঢোকেনি সেদিন। কিন্তু সকালে যখন চা খেতে ঢুকেছিল, তখন ভাস্করবাবু ছাড়া সবার চোখেই ছিল তারিফ। আর পুলিনবাবু তো বলেই ফেলেছিলেন, "রোজ এরকম শাড়ি পরে আসো না কেন মা? এভাবে এলে তো মা লক্ষ্মী না হলেও মা সরস্বতী তো বলাই যায়।" স্নেহাশিসবাবুও ছিলেন, তাঁরও যেন চোখের পলক পড়ছিল না। প্লাবিনীর তখনই মনে হয়েছিল সেই কথাটা, যেটা শুরুতেই বলা হয়েছে। পুরুষের বয়ঃসন্ধি সহজে কাটে না। তবে এঁদের তো নাহয় তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে! সত্যিকারের বয়ঃসন্ধিতে যারা, তাদের থেকেও কি মুক্তির জো আছে!

বাঁকুড়ার এই অখ্যাত কলেজটিতে ওকে নিয়ে সব মিলিয়ে ২৬ জন ফ্যাকাল্টি – ১৯ জন পুরুষ ও ৭ জন মহিলা। প্লাবিনীকে নিয়ে পিএইচডি রয়েছে ৬ জনের – ৪ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার; অন্য মহিলা হলেন ৫৫ বছর বয়স্কা বটানির লাবণ্যদি। ৭ জন মহিলা ফ্যাকাল্টির মধ্যে প্লাবিনী কনিষ্ঠতমা, বাকি ছজনের মধ্যে যিনি কনিষ্ঠা, সেই ইংলিশের পল্লবীদিই ওর থেকে বছর দশেকের বড় হবেন। তবে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে সবচেয়ে কনিষ্ঠ কেমিস্ট্রির ঋষভ মালাকার ২৬/২৭ হবে! আর পড়ুয়াদের কথা বলতে গেলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে হাজার খানেক ছেলেমেয়ে – ৬০০ মতো ছেলে আর ৪০০ মতো মেয়ে। তার মধ্যে ইংরেজি অনার্স, বাংলা অনার্স, হিস্ট্রি অনার্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স, ইকনমিক্স অনার্স এগুলোতে সিংহভাগ মেয়েরা – আড়াইশোর ওপর। কমার্সের সাবজেক্টগুলোতে ছেলে বেশ কম – শ'খানেকের বেশী হবে না, মেয়ে বড় জোর তিরিশ। আর সায়েন্সে সাড়ে তিনশো ছেলের সঙ্গে ১০০ থেকে ১১০ মেয়ে। সেখানে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-বায়োলজি-কম্পিউটার সায়েন্স-ম্যাথেই তিনশোর ওপর ছেলে চলে যায়। স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়ে থাকে গোটা চল্লিশেক ছেলে, মেয়ে বারো-তেরো মতো। শুধু স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্সদের পড়াতে দিলে প্লাবিনীর ভাগ্যে দিনে দুটির বেশী ক্লাস জুটত না। কিন্তু ম্যাথ আর স্ট্যাটের পাস্ কোর্সের ছেলেমেয়েরাও রয়েছে। তাই দিনে অন্তত চারটে করে ক্লাস পড়াতেই হয় প্লাবিনীকে। প্লাবিনী স্ট্যাট অনার্সের ফার্স্ট ইয়ারকে পড়ায় প্রব্যাবিলিটি, সেকেন্ড ইয়ারকে পড়ায় ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স আর থার্ড ইয়ারকে পড়ায় স্যাম্পল সার্ভে। এছাড়া ফার্স্ট ইয়ারের ম্যাথ পাস্ কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় ক্যালকুলাস আর ফার্স্ট ইয়ারের স্ট্যাট পাস্ কোর্সে পড়ায় বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স। মজার ব্যাপার হ'ল – ফার্স্ট ইয়ারের স্ট্যাট অনার্সের অধিকাংশই আবার ফার্স্ট ইয়ারের ম্যাথ পাস্ কোর্সের ক্লাসে রয়েছে। তাই এদের সঙ্গে সোম-বুধ-শুক্র দুবার করে দেখা হয়ে যায়। প্রথম প্রথম ফার্স্ট ইয়ার বলে ওরা একটু ভয়ে ভয়ে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহে এদের একটু সাহস বাড়তে শুরু করল। সোম-বুধ-শুক্র লাঞ্চের পর প্রথম পিরিয়ডেই ফার্স্ট ইয়ারের ম্যাথ পাস্ কোর্সের ক্লাস। একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে প্রায় দুশো ছাত্রের ক্লাস। শুধু স্ট্যাটিস্টিক্স নয়, ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-বায়োলজি-কম্পিউটার সায়েন্স অনার্সের ছাত্রছাত্রীরাও রয়েছে। প্রথমদিন অত বড় ক্লাসরুমে ঢুকে বেশ ঘাবড়েই গিয়েছিল প্লাবিনী। তবে ভাগ্য ভাল সেদিন বা তার পরের দিন তেমন কিছু হয়নি। এরপর শুক্রবার ক্লাসে ঢুকতেই একসঙ্গে অনেকগুলো হাততালি বেজে উঠল। প্লাবিনী আগেও খেয়াল করেছিল যে স্ট্যাট অনার্সের ছেলেমেয়েরা রয়েছে, সবাই এক

সঙ্গে থার্ড আর ফোর্থ রো-তে বসে। আজ সেই থার্ড আর ফোর্থ রো থেকেই একসঙ্গে হাততালি বেজে উঠল। প্লাবিনীও তিনদিনে বেশ কিছুটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। হেসে জিজ্ঞেস করল, "এর মানে?" তখন ফোর্থ রোয়ের একটি ছেলে বলে উঠল, "কিছু না, ম্যাডাম, আপনাকে আমরা একদিনে দুবার পাই, ভাল লাগে।" আরও কয়েকটি ছেলে তাতে সায় দিল। তারপর পরের সোমবার আর বুধবারও একই জিনিস হ'ল। প্লাবিনী এরপর বলল, "ঠিক আছে, তোমরা খুশি বুঝতে পারছি। কিন্তু সবার কথা ভাবো। অন্যরা তো আর দুবার পাচ্ছে না। ওদের তো একটু অড লাগতেই পারে!" তখন আরেকটি ছেলে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম, তবে একটা শর্ত। কাল আমাদের ফ্রেশার্স ওয়েলকাম। আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।"

প্লাবিনী গিয়েছিল সোনালী প্রিন্টের ঘন কালো তাঁতের শাড়ি পরে। ছেলেগুলো কেমন হাঁ করে ওকে দেখছিল। এদের মধ্যে একটু সাহসী যারা তারা তো বলেই ফেলেছিল, "ম্যাডাম, খুব সুন্দর লাগছে আপনাকে।" আর মেয়েরা অনেকেই বলেছিল, "ম্যাডাম, এত সুন্দর শাড়ি আপনার। আমাকে একদিন পরতে দেবেন?" ততক্ষণে প্লাবিনীর অনেক ফ্রেশার্সের নাম জানা হয়ে গেছে। ফার্স্ট ইয়ারে ১৬ জন ছেলে আর ৫ জন মেয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স। এই ১৬ জন ছেলের মধ্যে কিঙ্কর, অনুপ্রাস, সুরঞ্জন, সত্রাজিৎ, তরঙ্গ, দীপ্তজিৎ, আর চিরহরিৎ নামক'টি মনে থেকে গেল প্লাবিনীর। মেয়েদের মধ্যে প্রার্থনা আর মঞ্জরীর নাম মনে রইল। ছেলেদের মধ্যে কিঙ্কর, তরঙ্গ আর দীপ্তজিৎকে মনে হ'ল সবচেয়ে সাহসী, ওরা কয়েকজন মিলে যেমন একসাথে প্লাবিনীর সাথে সেলফি নিল, তেমনি কিঙ্কর, তরঙ্গ আর দীপ্তজিৎ একা করেও প্লাবিনীর সাথে সেলফি নিল। খাওয়াদাওয়ারও বেশ এলাহি আয়োজন হয়েছিল, প্লাবিনীও ভাগ পেল। তাই সেদিন ওকে শুধু গোলুদার দোকানের চা নয়, রাতে বাড়ি ফিরে ডিনারও স্কিপ করতে হয়েছিল। এদের মধ্যে অনুপ্রাসকেই মনে হ'ল সবচেয়ে ভীরু আর লাজুক। কিন্তু প্লাবিনী চোখের ভাষা ভালই পড়তে পারে। ও দেখেছে অনুপ্রাসের চোখে সেই চাউনি, যা পুলিনবাবু ও স্নেহাশিসবাবুর চোখে দেখতে পায়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্লাবিনী ভাবছিল অনুপ্রাসের কথা। এই ছেলেটি ১৮ পেরিয়ে গেলেও মনে হয় বয়ঃসন্ধির প্রাথমিক জড়তাটুকু এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

দিন কাটতে লাগল। স্ট্যাটিস্টিকসের শুধু ফার্স্ট ইয়ার নয়, সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েরাও আস্তে আস্তে প্লাবিনীর সঙ্গে মেশামেশি শুরু করল। বিশেষ করে ছেলেরা। সেকেন্ড ইয়ারে ১২টি ছেলে ও ৩টি মেয়ে আর থার্ড ইয়ারে ১৪টি ছেলে ও ৪টি মেয়ে। এদের মধ্যে সেকেন্ড ইয়ারের রাজরূপ, কল্লোল এবং অন্বয় অথবা থার্ড ইয়ারের শিহরণ এবং আলেখ্য মনে হয় একটু বেশী সাহসী। ক্লাসে প্রশ্ন করবার পাশাপাশি দরকারে-অদরকারে অফিস আওয়ারে ছুটে আসাটাও এদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আর সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারের কিঙ্কর, তরঙ্গ ও দীপ্তজিৎ তো রয়েছেই। এরা পড়াশুনোর কথা জিজ্ঞেস করবার ছুতোতেই আসে বটে, কিন্তু কখনো সুযোগ পেলে একটু ক্রিকেট, কোনো সিনেমা বা গান অথবা কোনো একটা ওয়েব সিরিজ নিয়ে টুক করে কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে প্লাবিনীর রিঅ্যাকশন দেখবার সুযোগ নিতে ছাড়ে না। মেয়েরাও আসে। থার্ড ইয়ারের আলেখ্যর সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় থার্ড ইয়ারের ইশারাকে। মনে হয় ইশারা-আলেখ্য একটি রোম্যান্টিক জুটি, দেখলে মন্দ লাগে না। হয়তো প্লাবিনী আসবার আগেই ওদের মধ্যে প্রেম দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। প্লাবিনীরও কলেজ জীবনে একজন ছিল, যাকে ছাত্র রাজনীতির কবলে পড়ে এমন মার খেতে হয়েছিল যে সারা জীবনের জন্য সে মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এরপর প্লাবিনী হয়তো বা ভয়েই আর কোনো সম্পর্কে জড়ায়নি।

ইশারা ও আলেখ্যর প্রেমের অঙ্কুর থেকে কুঁড়ি বেরোনোর দিন দেখবার সুযোগ না হলেও তরঙ্গ আর মঞ্জরীর মধ্যে প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম সাক্ষী হতে পারল প্লাবিনী। প্রথম প্রথম তরঙ্গ আসত হয় একা, নয়তো কিঙ্কর বা দীপ্তজিতের সঙ্গে। কিন্তু কিছুদিন পর ও মঞ্জরীর সঙ্গে আসতে লাগল। মনে হয় দুটিতে বেশ জমছে। এর কিছুদিন বাদে, যেদিন সামনে পরীক্ষা, তখন ওরা দল বেঁধে এল প্লাবিনীর অফিসে ডাউট জিজ্ঞেস করতে – কিঙ্কর, দীপ্তজিৎ, চিরহরিৎ, তরঙ্গ, প্রার্থনা, মঞ্জরী, এমনকি অনুপ্রাস পর্যন্ত। সেদিন পড়াশুনোর কথা বলবার পাশাপাশি সবাই খুব হাসছিল আর মজা করছিল – তরঙ্গ আর মঞ্জরীকেও সেই হাসিতে সামিল হতে দেখা গেল এবং দুজনের সেই হাসির মুহূর্তে একের অপরের দিকে চোরা চাউনি প্লাবিনীর চোখ এড়াল না। আর সেদিনই সেকেন্ড ইয়ারের ল্যাব শেষ করে বের হতে গিয়ে নিজের স্কুটির

দিকে এগিয়ে যাবার সময় প্লাবিনীর চোখে পড়ল সেই দৃশ্য, যেগুলোর মূল্য টাকা দিয়ে হয় না – তরঙ্গ আর মঞ্জরী ওর থেকে ৩০ ফুট দূরের একটি গাছের ছায়ায় দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কী কান্নাটাই না কাঁদছে! এই শহরে এসে নানান বুড়ো আর ছোঁড়াদের অস্বস্তিকর চাউনির কিছু দুঃসহ স্মৃতির পাশাপাশি এরকম কোনো সোনা দিয়ে বাঁধানোর মতো স্মৃতিও যে প্লাবিনীর স্মৃতির ভাণ্ডারে জমা পড়ল, তার জন্য অবশ্যই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে প্লাবিনী।

দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনটে মাস। তারপর পুজোর ছুটি। এই তিন মাসে প্লাবিনীর জীবন মোটামুটি একভাবেই চলেছে। সকাল-বিকেল পাড়ার বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে চা খাওয়া, তাদের গসিপ ও আড্ডার অংশ হওয়া, দিনেরবেলা কলেজে ছাত্র পড়ানোর পাশাপাশি ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে অত্যুৎসাহী ছেলেদের কারণে-অকারণে অ্যাকাডেমিক ও নন-অ্যাকাডেমিক নানান প্রশ্ন শোনা, একই সঙ্গে মঞ্জরী-তরঙ্গ, ইশারা-আলেখ্য বা সেকেন্ড ইয়ারের দৃষ্টি-রাজরূপের প্রেমকে বেড়ে উঠতে দেখা। এসবের মাঝে অনেক ছেলের যেমন তাদের টিচারদের ওপর ক্রাশ থাকে, সেটারও অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং প্লাবিনীর নিজেকে দিয়েই হয়েছে। শুধু ও যাদের পড়ায় তারাই নয়, অন্য ছাত্ররাও যে ওকে দেখলে দুচোখ ভরে তাকিয়ে থাকে না, তা নয়। সব দৃষ্টির অর্থ তো আর খারাপ নয়! তাই যে দৃষ্টিগুলোতে শুধুমাত্র তারিফ রয়েছে, সেগুলোকে ও মনে মনে এঞ্জয় করে। কিন্তু কিছু কিছু দৃষ্টি অবশ্যই অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, যেমন যাদের দৃষ্টিতে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা – যেন চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত এরা। এঁদের মধ্যে পাড়ার বয়স্করা যেমন রয়েছেন, তেমনি ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে ফার্স্ট ইয়ারের অনুপ্রাস বা সেকেন্ড ইয়ারের অন্বয়। অনুপ্রাস কিন্তু আজ অবধি একা ওর অফিসে আসেনি বা ক্লাসে কোনো কিছু জিজ্ঞেসও করেনি। কিন্তু অন্বয় একা বা বন্ধুদের সঙ্গে যেমন এসেছে, তেমনি কখনো বলেও ফেলেছে, "ম্যাডাম, গতকালের ড্রেসটা আরেকদিন পরে আসবেন?" এদের দৃষ্টি বা কথাকে তাও বা মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু কারুর কুদৃষ্টি মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। পাড়ার বয়স্কদের মধ্যে বিকাশবাবুর দৃষ্টিতে এই ব্যাপারটা দেখেছে প্লাবিনী, তেমনি কলিগদের মধ্যে ৫৬ বছরের ইকনমিক্সের প্রদ্যুৎবাবু বা ছাত্রদের মধ্যে থার্ড ইয়ারের শিহরণ গাঙ্গুলী।

শিহরণ যখন প্লাবিনীর দিকে তাকায়, তখন যেন আপাদমস্তক জরিপ করে নেয়। তাই শিহরণ কোনো পড়া বোঝবার জন্য ওর অফিসে এলে প্লাবিনীর মনে সত্যিই ভয়ের শিহরণ জাগে। কিন্তু সবার সামনে তো আর কিছু বলা যায় না, তাই জেনেবুঝেও না বোঝার ভাণ করতে হয়। প্রদ্যুৎবাবুর সঙ্গে অবশ্য প্লাবিনীর দেখা কমই হয়, তাই এখনো পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি। তবে শুনেছে ওঁর স্বভাবের গল্প পল্লবীদির কাছে।

সব মিলিয়ে এই তিন মাসের অভিজ্ঞতা মোটামুটি ভালই বলতে হয়। সেরকম কোনো বড়সড় সমস্যায় ওকে পড়তে হয়নি। চায়ের দোকানের কাকা-জ্যাঠাদের কাছ থেকে স্নেহ তো কম পায়নি ও! পুলিনবাবু, হৃষিকেশবাবু, ত্রিদিববাবু বা সুখেন্দুবাবুর কথাবার্তায় মাঝেমাঝেই স্নেহের পরশ পেয়েছে। উইকএন্ডে বাড়ি গিয়ে ফিরে এলে ওঁরা ওর বাবা-মার খবরাখবর নিয়েছেন। একবার ওর শরীর খারাপ হয়েছিল। দুদিন যেতে পারেনি কলেজে। ত্রিদিববাবু তখন বৌকে দিয়ে রাঁধিয়ে দুবেলা খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছেন। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কারুর কারুর মধ্যে ও দেখেছে ভালবাসার ছোঁয়া। দুদিন অসুস্থ থেকে জয়েন করবার পর অনেকেই ছুটে এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে ও খোঁজ নিতে। এদের মধ্যে অন্বয়ের ব্যাপারটা বোধহয় অন্যদের থেকে একটু বেশী। সে তো বলেই ফেলল, "ম্যাডাম, একবার কি জানানো যেত না ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে? আপনার পেজ তো পড়াশুনোর জন্য আমরা ফলো করি! সেখানেই লিখে দিতেন! দুদিন সত্যিই আমাদের অনেকের জন্য ভয়াবহ ছিল।" প্লাবিনী হেসে বলল, "তাই? আর কার কার জন্য ভয়াবহ ছিল শুনি?" অন্বয় আর বিশেষ কথা জুগিয়ে উঠতে পারল না।

পুজোয় বাড়িতে গিয়ে অনেক মজা হ'ল। এমনিতে উইকএন্ডে বাড়ি গেলে বেশী কিছু কথা বলা হয়ে ওঠে না। তখনও অনেকটা সময় নোটস বানাতে চলে যায়। এবারে গিয়ে মন খুলে অনেক গল্প হ'ল। দিদি, বিস্ময়দা আর সঙ্গে পুচকু দুটো থাকায় মজা হ'ল ডবল। ইউএস থেকে মাত্র হপ্তা খানেকের ছুটি নিয়ে এসেছে ওরা রিকি-কিকিকে কলকাতার পুজো দেখাবে বলে। সাত বছরের রিকি আর পাঁচ বছরের কিকি ওর অনেকটা সময় কেড়ে নিলেও এরই মাঝে বিস্ময়দা এসে সেই মজায় ভাগ বসাতে ছাড়েনি। দিদি দামিনী ওর চেয়ে দুবছরের বড়। মাস্টার্স

করার পরই ওর বিয়ে হয়ে যায়, আজ থেকে দশ বছর আগে। বিস্ময়দা দিদির থেকে দুবছরের বড়। তাই বিস্ময়দা আর প্লাবিনী যেন অনেকটা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো। সুযোগ পেলেই বিস্ময়দা ওর পেছনে লাগে, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে প্লাবিনীর পাড়ার বুড়োদের খবর, ওর কলেজের ছোঁড়াদের খবর সব বার করে আনে, যেগুলো এতবার উইকএন্ডে এসেও সে বাবা-মাকে বলে উঠতে পারেনি। সব শুনে বিস্ময়দা বলল, "হুঁ! মনে হচ্ছে এদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ইন্ডিয়াতে পুরুষরা মেয়েদের যে কী ভাবে! হয় দেবী নয় একেবারে ভ্যাম্প! মাঝামাঝি কিছু নেই।" দামিনী বলল, "যা বলেছ। মায়ামির বাঙালি গ্যাদারিং বা ইন্ডিয়ান গ্যাদারিং-এ গেলেও এরকম অনেক পীস দেখতে পাওয়া যায়। এত বছর ইউএসএ-তে থেকেও শোধরানোর কোনো চেষ্টা নেই!" বিস্ময়দা বলল, "কিছু একটা করতে হবে বুঝলে? নাহলে বেটাদের ঠিক টাইট দেওয়া যাবে না।" প্লাবিনীর একটু যেন খচ্ করে লাগল কথাগুলো। সবাই তো আর খারাপ নয়, অনেকে ওকে ভালও বাসে। ও তবু মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী করবে শুনি?" বিস্ময়দা বলল, "সময় এলেই দেখবি। তাড়া কীসের?... ঠিক আছে, ওসব কথা থাক। ক্রিসমাসে আসছিস তো?" সঙ্গে সঙ্গে রিকি-কিকিও ছুটে এল। বলল, "আসবে? কবে আসবে মানি?" ওরা মাসিমণি না বলে মানি ডাকে ওকে। দামিনী বলল, "অত পাগল হলে চলে? দেরী আছে।" বিস্ময়দা বলল, "তোদের স্কুল ছুটি হবে ক্রিসমাসে, তখন আসবে!" কিন্তু প্লাবিনী কি যাবে? টিকিটের দাম যে অনেক! তবে প্লাবিনীর আশঙ্কা দূর করে বিস্ময়দা বলল, "তুই শুধু 'হ্যাঁ' বল, বাকি টিকিট, ওখানে ঘোরা সব আমার দায়িত্ব।" বাধ্য হয়ে প্লাবিনীকে 'হ্যাঁ' বলতেই হ'ল। এইসব নানারকম গল্পগুজবে মিডটার্মের খাতা দেখা হ'ল না। বাধ্য হয়ে একদিন আগে ফিরে গিয়ে পুরো রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজের ফ্ল্যাটে বসে পাঁচটা কোর্সের সবকটা খাতা দেখা শেষ করল। অনেকেই ভাল করেছে। তবে সব মিলিয়ে চিরহরিৎ-এর খাতা দেখলে সত্যিই মন ভরে যায়, যেমন সুন্দর তার হাতের লেখা, তেমন কোনো উত্তরেই কলম ছোঁয়ানোর উপায় নেই, এতটাই নিখুঁত।

পুজোর ছুটির পর ফিরে এসে প্লাবিনী ইউএস যাবার দিন গোনা শুরু করে দিল। সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হবে আর ও ছুটবে। সেভাবেই টিকিট কেটে রেখেছে বিস্ময়দা। এর আগে দুবার ইউএস-এ গেছে প্লাবিনী। একবার যখন রিকির জন্ম হ'ল, আরেকবার যখন কিকি জন্মাল সেবার। প্রথমবার সঙ্গে মা ছিলেন, বাবা ছুটি পাননি। কিকির জন্মের সময় বাবা রিটায়ার করে গিয়েছিল। প্রথমবার বিস্ময়দা ওদের ওয়াশিংটন ডিসি-তে ক্যাপিটল আর স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম দেখিয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার দেখিয়েছিল নিউ ইয়র্কে নাইন ইলেভেন মিউজিয়াম, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, রকাফেলার সেন্টার। এবারের প্ল্যান কী কে জানে! এসব ভাবনায় মাঝে মাঝে পড়াতে পড়াতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় প্লাবিনী। এগুলো আবার তরঙ্গ বা কিঙ্কর বা মঞ্জরী বা অন্বয়ের চোখ এড়ায় না। মঞ্জরী একদিন বলেই ফেলল, "কী ভাব বলো তো দিদি আজকাল? পড়াতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যাও!" হ্যাঁ, আজকাল অনেকে ওকে 'তুমি' বলে। অন্বয় একদিন বলল, "ম্যাডাম! সব কিছু ঠিকঠাক তো? আপনাকে কেমন যেন আনমনা দেখি মাঝে মাঝে! বাড়িতে সব ঠিকঠাক?" প্রথমে প্লাবিনী কিছু বলেনি। পরীক্ষা হয়ে গেলে যখন ছেলেমেয়েরা নম্বর জানতে এল, তখন প্লাবিনী বলল যে ও ইউএসএ-তে যাচ্ছে। কিঙ্কর বলল, "সে তো খুব ভাল! সুন্দর সুন্দর ফটো লাগাবেন ইনস্টাগ্রামে। আপনার চোখ দিয়ে আমরাও ইউএসএ দেখব।"

বিস্ময়দার আটদিন ঘোরবার প্ল্যান। তার মধ্যে পাঁচদিন অরল্যান্ডোতে, তিনদিন ডিজনি ওয়ার্ল্ড আর দুদিন ইউনিভার্সাল ষ্টুডিও। রিকি-কিকি আর প্লাবিনী যেন একটা টীম আর বিস্ময়দা-দামিনী অন্য টীম। রিকি-কিকির সঙ্গে অনেক হৈহুল্লোড় করে পাঁচদিনে অরল্যান্ডো থেকে সমস্ত মজা শুষে নিল প্লাবিনী। তারপর শেষ তিনদিন মায়ামি। একদিন যাওয়া হ'ল কী ওয়েস্ট, একদিন এভারগ্লেডস এয়ারবোট রাইড, আর শেষদিন মায়ামির সাউথ বীচ। মায়ামিতে দেখার বাকিও রয়ে গেল কিছু। "ভাবিস না, পরেরবার হবে।" বলল বিস্ময়দা। কী ওয়েস্ট-এ আর্নেস্ট হ্যামিংওয়ের বাড়ি দেখলে সত্যিই চমৎকৃত হতে হয়। সেই ক্লাস এইটে ওঁর ছোট গল্পের একটা কালেকশন পড়েছিল প্লাবিনী, এবারে তাঁর বাড়িটি দেখা হয়ে গেল। এয়ারবোট রাইডে গোটা দুয়েক কুমির চোখে পড়ল। মায়ামিতে জানুয়ারী মাসেও ঠান্ডা নেই বললেই চলে, তাই বীচের মজা পুরোপুরি উপভোগ করা যায়। পরদিন নিউ ইয়ার ডে-তে প্লাবিনীর ফেরার দিন।

কলকাতায় এসে কষ্ট করে দিনটা জেগে থেকে জেট-

ল্যাগ দূরে রাখার চেষ্টা করল প্লাবিনী | তারপর রাতে শুতে গিয়েও ভালমতো ঘুম হ'ল না | সাড়ে ছটার মধ্যে রেডি হয়ে ব্যাগ গুছিয়ে বাবা-মাকে 'বাই' করে উবার নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন | আটটার ট্রেন ধরে বাঁকুড়ায় পৌঁছে প্লাবিনী যখন নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকল, তখন একটা বাজতে বেশী দেরী নেই | মা হটকেসে খাবার ভরে দিয়েছেন | সেটাই খেয়ে নেবে | তারপর একটু বিশ্রাম | বিকেলে পাড়ার দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে বাড়ি ফিরে রান্নাবান্না করে, খেয়ে কালকের পড়ানোর টপিকগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে এমনটাই প্ল্যান | কিন্তু দুপুরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল প্লাবিনী, জেটল্যাগের জন্য সেই ঘুম ভাঙল সন্ধ্যে সাতটা বাজতে দশে | এখন আর চা খেতে যাবার মানে হয় না | তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু রান্না করে নিল | তারপর নোটস নিয়ে বসল | আজ থেকে নতুন সেমিস্টার, নতুন রুটিন | প্লাবিনী আগেই ইমেলে জেনে গেছে ওর শিডিউল | একই ছেলেমেয়েদের পড়ানো, শুধু কোর্সগুলো পাল্টেছে | প্লাবিনী ওর রুটিন কাজগুলো করতে গিয়ে দেখল ওর হাতে খানিকটা সময় আছে, তাই ফ্রীহ্যান্ডে আজ একটু বেশী সময় দিল | এই কদিন ইউএসএ-তে থাকায় শরীরচর্চা হয়ে ওঠেনি | আজ একটু বেশী ঘাম ঝরানো দরকার | এরপর সব সেরে যথাসময়ে হাজির হ'ল গোলুদার দোকানে | সেখানে একটা ধাক্কা খেতে হ'ল | এই অল্প কদিনেই কি সবকিছু পাল্টে গেল? প্লাবিনী গিয়ে পুলিনবাবু, সুখেন্দুবাবু, ত্রিদিববাবু, ভাস্করবাবু এঁদেরকে দেখতে পেল ঠিকই, কিন্তু সবাই কেমন যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত | প্লাবিনী একবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ভাল তো সবাই?" ত্রিদিববাবু আর পুলিনবাবু একবার শুধু চাইলেন মাত্র আর ত্রিদিববাবু সংক্ষেপে বললেন, "হ্যাঁ, ভাল |" প্লাবিনী ব্যাপারটার মাথামুন্ডু কিছু বুঝল না |

এরপর কলেজে পড়াতে গিয়েও কেমন সব খাপছাড়া লাগল | সবাই রয়েছে কিন্তু সবাই যেন খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে | যারা সবচেয়ে বেশী প্রশ্ন করে, তারাও পুরোপুরি চুপ | ও ইউএসএ-তে যাওয়ায় কি লোকজন ভাবছে ওর দেমাক বেড়েছে? ওর আচরণে কি কিছু প্রকাশ পেয়েছে? ও বলেই ফেলল, "কাম অন গাইজ, সে সামথিং!" কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি | লাঞ্চের পর ম্যাথ পাস্ কোর্সের ক্লাস, তাতেও প্রায় একই ব্যাপার | দু'একটি নতুন ছেলে একটা দুটো প্রশ্ন করল মাত্র | ব্যস, আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ | আজ ল্যাব নেই, তবে অফিস আওয়ার রয়েছে | অফিস আওয়ারও ঘটনাবিহীনভাবে কাটতে লাগল | কেউ এল না | একঘন্টার অফিস আওয়ারের পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটবার পর প্লাবিনী যখন ভাবছে আর থেকে কী হবে, তখনই চমক! দরজায় এসে দাঁড়াল অনুপ্রাস! প্লাবিনী বলল, "দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে আয়, বোস!" অনুপ্রাস এসে মাথা নীচু করে বসল | এক-দু মিনিট অপেক্ষা করে প্লাবিনী বলল, "কীরে, কিছু বল!" এবারে আস্তে আস্তে মুখ তুলল সে | সোজা প্লাবিনীর চোখে চোখ রেখে নীচু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল, "এমনটা কেন করলে দিদি?" প্লাবিনী বলল, "কেন? কী করেছি?"

- "দিদি, তোমাকে যে আমরা আদর্শ ভাবতাম | দেবীর আসনে বসিয়েছিলাম | কী করে তুমি এমনটা করতে পারলে?" বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল অনুপ্রাস |

প্লাবিনী ওর পিঠে হাত রাখলে হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিল ও | প্লাবিনী স্তম্ভিত হ'ল | কী হতে পারে!

- "প্লিজ বল আমাকে, কী হয়েছে? কী করেছি আমি?"
- "কী সব ফটো লাগিয়েছ তুমি! ক্লাসের শয়তান ছেলেরা তো খুব মজা পেয়েছে | বলছে 'এমনটাই তো চাইছিলাম'| কেন করলে দিদি?" (বলে আবার কান্না)
- "কোথায় ফটো লাগিয়েছি? কী ফটো?"
- "ইনস্টাগ্রামে |"
- "ইনস্টাগ্রামে? আমি তো আটদিন ট্যুরের আটটা ফটো লাগিয়েছি মাত্র, রোজ একটা করে | প্রথম পাঁচদিন ডিজনি ওয়ার্ল্ড আর হ্যারি পটার স্টুডিওর, তারপর একদিন এভারগ্লেডসে কুমির, একদিন কী-ওয়েস্টে হ্যামিংওয়ের বাড়ি, আর অ্যাটলান্টিকে সমুদ্রের ঢেউয়ের ছবি | আর কী লাগিয়েছি?
- "কেন, এগুলো তুমি লাগাওনি?" বলতে বলতে অনুপ্রাস ওর মোবাইলে ইনস্টাগ্রাম খুলে যে ফটো ওর চোখের সামনে ধরল তাতে চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়! জলের মধ্যে আধশোয়া বিকিনিপরা প্লাবিনী | সারা ফটোতে সবার আগে যা চোখে পড়ছে তা হ'ল প্লাবিনীর উরুজোড়া; বোঝা যায় ক্যামেরার চোখও

ওখানেই ছিল | প্লাবিনী হতবাক! সত্যিই ওর মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না | কে তুলল এই ছবি, দিদি না বিস্ময়দা? অনুপ্রাস এক মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু বলতে পারলে না তো? কীই বা বলবে? আশ্চর্যের ব্যাপার হ'ল একজন তোমার প্রোফাইলে আটটা ফটো আর চারটে ভিডিও লাগাল, আর তুমি কিছু জানলে না? এটা বিশ্বাস করব বলতে চাও?" প্লাবিনী বলল, "সত্যি অনুপ্রাস, আমি কিছু জানতাম না | গত চারদিন আমি ইনস্টাগ্রাম খুলিনি |" অনুপ্রাস ব্যঙ্গের হাসি হেসে ফোনটা পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছিল, এমন সময় প্লাবিনী বলল, "দেখি একবার কে শেয়ার করেছে?" অনুপ্রাস বলল, "তুমি নিজের ফোন খুলে দেখে নিও |" বলে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল | প্লাবিনী বলল, "অনুপ্রাস, প্লিজ, ভাইটি আমার, আমি তোকে কথা দিচ্ছি! যে এমনটা করেছে, তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না |" অনুপ্রাস এক ঝলক প্লাবিনীর দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল |

সে চলে গেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল প্লাবিনী! দিদি না বিস্ময়দা, কে এই সর্বনাশ করল? প্লাবিনী দ্রুত পার্স থেকে ফোন বার করে ইনস্টাগ্রাম খুলল | ইনস্টাগ্রামে প্লাবিনী কোনদিনই ওভারঅ্যাক্টিভ নয়, গত কয়েকমাস স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে অ্যানাউন্সমেন্ট পোস্ট করাতেই এটা মূলত ব্যবহার হতো | অনেকদিন বাদে সে নন-অ্যাকাডেমিক কিছু লাগিয়েছিল ইউএসএ-তে গিয়েছিল বলে; তাও মাত্র আটটা ছবি | অনুপ্রাসের বলামতো বীচের আটটা ছবি আর চারটে ভিডিওর একটাও ও লাগায়নি | লাগিয়েছে সে, যে বলেছিল বেটাদের টাইট দেওয়ার কথা | যেহেতু ওর অ্যাকাউন্ট অ্যাকাডেমিক কাজে ব্যবহার হতো, ও এটাকে পাবলিকই রেখে দিয়েছিল | এখন বুঝল বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিল | প্লাবিনী অফিসের দরজা বন্ধ করে একে একে দেখল ফটো আর ভিডিওগুলো | ক্যামেরার চোখ যে কতটা ঘৃণ্য, কতটা নীচ কাজ করতে পারে এই ফটো আর ভিডিওগুলো তার প্রমাণ | বেশীরভাগ ফটোতেই মূল ফোকাস প্লাবিনীর শরীর | প্লাবিনীর শরীরের নানান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপরেই ক্যামেরার ঘোরাফেরা | সমুদ্রটা এখানে গৌণ, যেমন অনেক অ্যাডে প্রোডাক্টের থেকে নারী-শরীর হয়ে ওঠে মূল পণ্য | একটি ভিডিওতে ক্যামেরার উদ্দেশ্য একদম জলের মতো স্পষ্ট | প্লাবিনী সমুদ্র থেকে তীরের দিকে ছুটে আসছে, ক্যামেরার চোখ ওর ওপর, শেষপর্যন্ত ভিডিওটা থামল তার শরীরের নিম্নার্ধে | আর দেখে লাভ নেই, বন্ধ করে দিল সে ইনস্টাগ্রাম | বাইরে বেরিয়ে স্কুটিতে স্টার্ট দিতে যাবে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল অন্বয় | হাঁফাচ্ছে | একটু হাসল, বলল, "ম্যাডাম, চিন্তা করবেন না | আমি অন্তত আপনার পাশে আছি | এই দুনিয়াতে মেয়েদের এইভাবে কলঙ্কিত করবার জন্য কোটি কোটি পুরুষ রয়েছে | আপনি যখন ফটোগুলো লাগাননি, তখন এতে আপনার যে সমর্থন নেই, তা আমার থেকে ভাল কেউ বুঝবে না | গত কয়েক মাসে আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনেছি |" প্লাবিনীর দুচোখ ভরে জল এল | কোনোরকমে চোখটা মুছে অন্বয়ের মাথার চুলটা একটু ঘেঁটে দিয়ে বলল, "তোর মতো ছেলে সত্যিই লাখে একটা | যা, বাড়ি যা | ভাল থাকিস!" প্লাবিনী স্কুটিতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনল অন্বয় বলছে, "দিদি, আমি সবাইকে বোঝাব | দায়িত্ব নিলাম |"

বাড়ির গলিতে এসে আর চায়ের দোকানে গেল না | একটু বিস্কুট আর চানাচুর কিনেছিল, সেগুলোই খেল | তারপর অপেক্ষা | ওর ঘড়িতে যখন ছটা আর ইস্টার্ন টাইম সাড়ে সাতটা, তখন হোয়াটস্অ্যাপে কল করল | বিস্ময়দা ফোন ধরল না, টেক্সট লিখল, 'বাচ্চাদের স্কুলে ড্রপ করে অফিসে গিয়ে ফোন করছি |' দিদিকে ফোন করল, দিদি ধরল, তবে বলল, "একঘন্টা বাদে কর! একটু শুতে দে!" যেন কারুর কিছু এসে যায় না! প্লাবিনী অপেক্ষা করতে লাগল | ঠিক চল্লিশ মিনিট বাদে ফোন এল | প্লাবিনী ফোন ধরে ক্লান্তভাবে বলল, "কেন করলে এটা, বিস্ময়দা?" বিস্ময়দা খানিকটা হাসল, তারপর বলল, "কী, বলেছিলাম না বেটাদের টাইট দিতে হবে? তুই যেভাবে বুড়ো আর ছোঁড়াদের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলি, তা থেকে তোকে বাঁচানোর জন্য এটাই বেস্ট মনে হ'ল!" প্লাবিনী কয়েক সেকেন্ড সময় নিল কথাটা হজম করতে | তারপর বলল, "কোনো শত্রুরও যেন তোমার মতো নোংরা লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা না হয়!" বিস্ময়দা বলতে যাচ্ছিল, "প্লাবিনী, প্লাবিনী, কথা শোন, বোন!" - "হেল উইথ ইওর 'বোন', লম্পট কোথাকার!" বলে প্লাবিনী লাইন কেটে দিল | মনে মনে নিজেকে বলল, অনুপ্রাসকে দেওয়া কথাটা ওকে রাখতে হবে | তবে রিকি-কিকি চাইলে তাদের জন্য দরজা খোলা রাখবে সে |

প্রবাস বন্ধু

নববর্ষ সংখ্যা ১৪৩৩ (2026)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হয়।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। **Word**-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
6 Wimberly Court
Decatur, GA 30030-2802
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
লেখা পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে নববর্ষ আর দুর্গাপুজোর পনেরো দিন আগে লেখা জমা দিন।
এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রবাস বন্ধু ওয়েববসাইটে **https://www.prabashbandhu.org/**
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ
নববর্ষ